পরিব্রাজকের ডায়েরী

শ্রীনির্মলকুমার বসু

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

1797
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR.
5302

পরিব্রাজকের ডায়েরী

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE * BANIPUR *

পরিব্রাজকের ডায়েরী

1797

5302

শ্রীনির্মলকুমার বসু

S. C. E. R. T. West Bengal L y Calcutta 25/3, B. C. Road

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ
মহালয়া ১৩৬৬ সন

C.E.R.T. W.B. LIBRARY
..
Acen. No. 9370

॥ প্রচ্ছদ ॥
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত ॥

প্রবন্ধ-সূচী

ভূমিকা

পরিব্রাজকের ডায়েরীর প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। সেগুলিকে বই-এর আকারে সাজাইতে গিয়া যে সূত্র অবলম্বন করিয়াছি তাহার পরিচয় পাঠকগণের নিকট দেওয়া প্রয়োজন, নয়তো সমস্ত ডায়েরীটি তাঁহাদের কাছে এলোমেলোভাবে সাজানো বলিয়া মনে হইতে পারে।

শহুরে জীবনের জড়তা ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্যই প্রথমে প্রকৃতির স্বরূপসন্ধানে অনুরাগী হইয়াছিলাম। প্রথম পাঁচটি লেখায় সেইজন্য প্রকৃতির রূপই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে বনে জঙ্গলে যে-মানুষ বাস করে তাহাদের সংস্কৃতির অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত রূপের সংবাদও স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তির স্থান নাই, অচেনা সংস্কৃতি তাহার সমগ্রতা লইয়াই প্রথমে মনের নিকট ধরা দেয়।

কিন্তু ক্রমে সেই সকল সমাজের সমগ্র রূপ টুটিয়া এক একজন ব্যক্তির রূপ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। দ্বিতীয় স্তবকের লেখাগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। গ্রামের সংস্কৃতির মধ্যে যাহা কিছু জীবন্ত, যাহা কিছু সত্য তাহা ধাওতাল অথবা চইতার মত মানুষের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

এমন মানুষের সন্ধান লাভের পর অন্তরে ভরসা পাইলাম। নিজেদের সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করিবার মত উৎসাহ হইল। সেখানে আসিয়া দেখিলাম, মানুষ নানা রূপে নিজেকে বিকশিত করিয়াছে। কেহ কবি, কেহ শিল্পী, কেহ দেশসেবকের আকৃতিতে আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ধাওতাল অথবা চইতার মধ্যে অরণ্যজাত বৃক্ষের যে ঋজুতা বর্তমান, হয়তো ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। হয়তো জনবহুল সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বর্ধিত হওয়ার ফলে সকলের দেহে আঘাতের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু যেখানে তাঁহাদের চিত্ত জয়যুক্ত হইয়াছে সেখানে চরিত্রের মহত্ত্ব যেন আকাশের স্পর্শ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই ভরসায় আরও নিবিড়ভাবে আমাদের চারিদিকের সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঘনিষ্ঠ দৃষ্টির ফলে অনেক দুর্বলতাই চোখে পড়িল। কিন্তু আঘাত করিবার ইচ্ছা হইল না, উপহাসের অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। "অধ্যাপক" হইতে "স্বর্গের সংবাদ" পর্যন্ত লেখাগুলি চতুর্থ পর্যায়ে পড়ে।

পঞ্চম স্তবকের লেখাগুলিতে উপহাসের আঘাতটুকুও আর নাই। প্রকৃতির সংস্পর্শে, প্রকৃতিজ মানুষের ঋজু ব্যক্তিত্বের সঙ্গগুণে যে-শক্তি লাভ করিয়াছিলাম তাহার প্রভাবে পারিপার্শ্বিক জীবনের গ্লানিটুকুও যেন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। আমাদের সমাজের মধ্যে, শহরের সংস্কৃতির আবেষ্টনের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করিয়াও মানুষ যে পূর্ণতম ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে এই সত্যের সন্ধানে ভক্তিভরে তীর্থের শেষ অঙ্কটুকু আগাইয়া চলিলাম। ফলে যাহা লাভ হইল তাহা "স্বস্তিক" হইতে শেষ পর্যন্ত অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধাওতাল অথবা চইতার সারল্যের মধ্যে যে মহত্ত্ব পাইয়াছিলাম তাহারই দর্শন আরও জটিলতর জনবহুল সমাজের মধ্যেও পুনরায় পাওয়া গেল। মানুষের ব্যক্তিত্ব যে আবেষ্টনের সর্ববিধ বন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারে, এই সত্যের সমর্থনই আমার সকলের চেয়ে বড় লাভ হইল।

মানুষের মন অজেয়। অজয় নদীর কূলে এই অতি পুরাতন সত্যটিকে নিজের জীবনে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। প্রকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে নূতন রূপে ধরা দিল। তাহা "বসন্ত" অথবা "উৎসব" প্রবন্ধের প্রকৃতির মত সরল নয় বটে, তদপেক্ষা গুরু, হয়তো জটিল, কিন্তু সত্যের গুণে ভাস্বর। তীর্থের অন্তকালে এই যে নবীন, অথচ প্রাচীন, সত্য জীবনে লাভ করিলাম তাহা যেন আমাদের সকলের জীবনকে শক্তি এবং সমৃদ্ধি দান করে, ইহাই প্রার্থনা করি।

—লেখক

কোলেদের দেশ

সিংহভূম জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। নিকটে একটি পার্বত্য নদী। তাহারই কূলে নাকি এক অতি প্রাচীন কালে মানুষ বাস করিত। তখনও ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই, পাথরের যন্ত্র দিয়াই মানুষ নিজের সব কাজ চালাইত। সেই যুগের কিছু যন্ত্র বা অস্ত্র এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিয়া এখানে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। সকাল হইতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া দুইখানি চমৎকার কুঠার খুঁজিয়া পাইয়াছি; নীল কঠিন পাথরের তৈয়ারি, কি তাহার ধার, কি সুন্দর গড়ন!

সেই যুগের মানুষের কথা ভাবিতেছি। শুধু কুঠার কেন? ইহারা কি কেবল যুদ্ধই করিত? পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ইহাদের ছিল না? না, তাহা হয় না। হয়তো চাষবাসের যন্ত্রগুলি তাহারা কাঠের দ্বারা নির্মাণ করিত, এখনও পৃথিবীর কোন কোন জাতি সেরূপ করিয়া থাকে। হয়তো পাথরের কুঠারগুলি অন্য কোনও ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের এখন জানা নাই। যা'ক, বৃথা কল্পনা করিয়া লাভ নাই। এই রকম পাথরের যন্ত্র নির্মাণ করিতে কত পরিশ্রম হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যা'ক।

নিকটে নদীর জল কলকল স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল। দূরে অনাবৃত দেহে কয়েকজন কোল-রমণী স্নান করিতেছিল, কেহ বা পিতলের কলস মাটি দিয়া মাজিতে বসিয়াছিল। যাহারা স্নান করিতেছিল, তাহারা অনাবৃত দেহের আনন্দে হাসিতেছিল। আর দুইজন পরনের কাপড় পাথরের উপরে

শুকাইতে দিয়াছিল। তাহাদের গায়ে শুধু ক্ষুদ্র কটিবস্ত্র ছিল বলিয়া পিছন ফিরিয়া কতক্ষণে কাপড় শুকায় তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

জলে নামিয়া দুইখানি ভাল পাথর কুড়াইয়া ভাঙিতে বসিলাম। ঠক্ ঠক্ শব্দে ঠুকিয়া ঠুকিয়া যাহা গড়ি, তাহাকে কল্পনার সাহায্যেই বলিতে হয়, ইহা কুঠার, ইহা কোদাল। দেখিয়া বলে কাহার সাধ্য? তবু ছাড়িলাম না, ঠুকিতে ঠুকিতে মোটামুটি যখন একখানি অস্ত্রের মত পদার্থ গড়িয়া আনিয়াছি, তখন হঠাৎ শেষের আঘাতে আহার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। দুঃখ হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন মানবের প্রতি আমার ভক্তি সহসা বাড়িয়া গেল। তাহাদের পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর কুঠার তো আমার পাশেই রহিয়াছে! কতখানি পরিশ্রম, কত কৌশ এবং অভিজ্ঞতাই না ইহার পিছনে লুকাইয়া রহিয়াছে! পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত বলিয়াই কি তাহারা অসভ্য? ধাতুর ব্যবহার তখন মানুষে শিখে নাই। কিন্তু যাহা জানিত, তাহার জন্য তো কম বুদ্ধি, কম অধ্যবসায় ব্যয় করিতে হয় নাই।

অলস মধ্যাহ্নে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। দূরে মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। মাঘ মাসের শেষ, মাঠে আর ধান নাই, সব কাটা হইয়া গিয়াছে। কেবল নদীর পরপারে ক্ষুদ্র ক্ষেতে খেসারি ও ছোলার গাছ হইয়াছিল, সেখানে খড়ের সামান্য নীড় বাঁধিয়া একজন লোক পাহারা দিতেছিল। রাখাল বালকেরা গরু মহিষের পাল লইয়া জলের ধারে নামিয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বাঁশের বাঁশিতে অতি সাধারণ একটি সুর বার বার সাধিতেছিল, সুরটির মিষ্টতার যেন আর শেষ নাই। নদীর ধারে কোথাও বা এক-আধটি কুলগাছ। কোল-রমণীগণ ইতস্ততঃ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়া কুল পাড়িতেছিল। একজন গাছ ধরিয়া নাড়া দেয়, পাঁচজনে তাহা কুড়াইয়া খায়। ইহারা বনের

মধ্যে একা চলে না, তুই চারিজন একসঙ্গে যায়। বোধ হয়, একা যাইতে ভয় পায়।

ওপারে যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি দেখা যাইতেছিল তাহার প্রান্ত দিয়া সরকারী পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে। একদল কোল-রমণী সেই পথে মজুরি করিয়া ফিরিতেছিল। রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্নে তাহারা এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিল। আমি এক পাথরের উপর বসিয়া তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলাম। সিংহভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী কোল হইলেও সময়ে সময়ে বাংলা গান গাহিয়া থাকে। রমণীগণ ছায়ায় বসিয়া গান ধরিল। কি গান ভাল বুঝিতে পারিলাম না, তবে তুই তিনটি পরিচিত শব্দ কানে ভাসিয়া আসিল—পিরীতি, কালা, রমণী। এই খোলা মাঠের দেশে যেখানে দূরে বনেভরা শ্যামল পাহাড়ের মালা দিগন্ত ঘেরিয়া আছে, সুরটি যেন সেখানে চারিপাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়। অনেকক্ষণ তাহাদের টানিয়া টানিয়া গান গাওয়া শুনিলাম। পথ দিয়া একখানি মোটর-লরি যাত্রীর দল লইয়া ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়া গেল। বোধ হয় কেহ রসিকতা করিয়া থাকিবে, রমণীগণের হাস্যে চকিত হইয়া উঠিলাম। তাহারা হাসিয়া উঠিয়া পড়িল এবং আবার পথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

অলস দিবস পার হইয়া সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জলের প্রান্তে নামিয়া আসিলাম। কত বিচিত্র রঙের পাথরের উপর দিয়া স্বচ্ছ জলধারা বহিয়া যাইতেছিল, তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনটি লাল, কোনটির গায়ে সমান্তরাল কৃষ্ণরেখার মালা, জলতরঙ্গে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটি বা নীলাভ চতুষ্কোণ, তরঙ্গের আঘাতে তাহার নীল আভা যেন নৃত্য করিতেছে। পাথরগুলিকে কুড়াইয়া লইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, হাতে লইতেই তাহাদের শোভা

নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহারা প্রাচীন স্থাণু পাথরের খণ্ডে পরিণত হইল। কোথায় তাহাদের রূপ, কোথায় বা সেই রং!

কোলেদের জীবন-নাট্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদের দেশের লোকের মতই পরিশ্রম করে, লজ্জা পায়, ভীত হয়, গান গায়, বাঁশি বাজায়। সবই করে, কিন্তু যৌবনের কলরবে তাহাদের সবই যেন সুন্দর দেখায়। সেই একই মানুষের মন, এখানেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমনই, প্রভেদ কেবল প্রকাশের ভঙ্গীতে। আমরা লজ্জিত হই, ভয় পাই, কিন্তু স্পষ্টভাবে যেন সব কথা প্রকাশ করিতে পারি না। কোলেরা প্রকাশ করিতে ভয় পায় না। আনন্দ হইলে গান গায়, খেলার ইচ্ছা হইলে খেলে। আবার স্ত্রীর নাচগান করা পছন্দ না হইলে চেলা কাঠ লইয়া তাহাকে তাড়া করে, স্ত্রী ভয়ে পলাইয়া যায়। কিন্তু ঈর্ষার মধ্যে তাহার প্রতি স্বামীর অনুরাগের আভাস পাইয়া পুলকিত মনে হাসে, ইহাও দেখিয়াছি। এই স্বচ্ছ প্রকাশেই ইহাদের জীবনকে আমাদের অপেক্ষা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের জীবনের উপর দিয়া যেন স্বল্পতোয়া পার্বত্য নদী মুখর শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, আর আমাদের জীবনের অন্তঃস্থল যেন সভ্যতার গভীর জলে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তাহার না আছে গতি, না আছে স্বচ্ছতা। আবরণের ভারে আমরা নিষ্পেষিত হইয়া আছি, জীবনের অন্তরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঋজু সরলভাবে ভাবিতে বা করিতে আমাদের হৃদয় সংকুচিত হইয়া যায়।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনের কথা ভাবিতে আর ভাল লাগিল না। নদী পার হইয়া মাঠ ভাঙ্গিয়া প্রবাসের ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। ওপারে গ্রামের প্রান্তে নদীর কূলে দেখিলাম, কাহার একখানি নূতন সমাধি রচিত হইয়াছে। বোধ হয় কোনও নারী হইবে; তাহাকে উত্তর

শিয়রে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। মাটি একান্ত কাঁচা রহিয়াছে, সমাধির উপরে কতকগুলি পাথর চাপানো, যেন শিয়ালকুকুরে শবদেহ লইয়া যাইতে না পারে। আর তাহার উপরে একখানি দড়ির খাটিয়া পায়া ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে। এই খাটেই নারীর দেহ শেষ প্রবাসের যাত্রায় আসিয়াছিল। কাছে একখানি কুলার উপরে লালপাড় শাড়ির ছিন্ন অংশ এবং কয়েকখানি হরিদ্বর্ণ পত্র সযত্নে সজ্জিত ছিল। আত্মীয়েরা হয়তো স্মৃতির উদ্দেশে বসন ও ভূষণের এই সামান্য উপকরণ নিবেদন করিয়া গিয়াছে।

মনটা ভারি হইয়া গেল। পথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিলাম। দূরে পাঁচ ছয় জন লোক একটি বাঁশে এক মৃত গাভীর চারি পা একত্র বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল। আশ্চর্য হইবার কিছুই ছিল না। গাভীর মাথাটি নেতাইয়া পড়িয়াছিল এবং বাহকগণের অসমান গতির জন্য দুলিতেছিল। হয়তো অল্পক্ষণ পূর্বেই ইহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু কাছে আসিতে হঠাৎ চমক লাগিল। গাভীটির পশ্চাদ্‌ভাগে অর্ধপ্রসূত বৎসের দেহার্ধ প্রলম্বিত হইয়া ছিল, তাহার মাথা ও একটি পা যেন বাহির হইবার বিপুল চেষ্টায় টান হইয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম এই অনাগত বৎসই মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বাহকগণের পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মর গয়ী? সে আমার দিকে না চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, হাঁ বাবু, মর গয়ী।

হায় রে! জন্ম এবং মৃত্যুর এই দুর্জ্ঞেয় পটভূমির সম্মুখে আমরাও যেমন এই অবোধ জীবও তেমনই। দুই জনের মধ্যে প্রভেদ কিছুই নাই, ব্যথা দুইজনেই সমান পায়। মানুষে মানুষেই বা প্রভেদ কোথায়? কেহ বা ক্ষণেকের আনন্দে কলরব করিয়া ওঠে, কেহ বা করে না।

কিন্তু দুই জনের পিছনেই সেই একই অজ্ঞেয় পটভূমি যাহার সন্মুখে জীবনের সকল লীলা আকাশের অন্ধকার পটভূমির সম্মুখে নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে এবং অবশেষে একদিন সেই অন্ধকারের মধ্যেই ম্লান শীতল হইয়া যায়। প্রাচীন যুগের প্রাচীন মানব যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা সবাই তেমনই একদিন ধরিত্রীর ক্রোড় হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব।

শহরে

যেসব শহরে মানুষ সদাই ব্যস্ত থাকে, হাতুড়ি পেটে, কল-কারখানায় কাজ করে, প্রকৃতিকে নিংড়াইয়া লোহা তামা বা অন্যান্য ধনসম্পদ আদায় করিয়া লয়, যে সকল শহরে মানুষ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজনোচিত বীর্যের দাপটে পৃথিবীর বুকে ইট পাথর ও লোহার স্তূপ রচনা করিয়া থাকে, তাহাদের কথা বলিতেছি না। তাহা ছাড়াও এক প্রকার শহর বা পল্লী আছে, যেখানে মানুষ ইটের বিবরের মধ্যে হাঁপাইয়া ওঠে, অথচ পেটের দায়ে বা সমাজের বন্ধনে হয়তো তাহাকে সেই বিবরের মধ্যেই বারমাস তিরিশ দিন বাস করিতে হয়। এমনই শহরের একটি পুরাতন পল্লীতে বাসা খুঁজিতে বাহির হইলাম। অবশেষে বাসাও মিলিয়া গেল। অতি সংকীর্ণ একটি গলি, তাহার প্রবেশের মুখে আবর্জনার স্তূপ ও বর্ষার কাদায় মিলিয়া একটি তুর্লঙ্ঘ্য অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ঘর তুইটি ভাল। নীচের তলায় হইলেও আলো-বাতাস খেলে, কোলাহল নাই, তাই ঘরটি পছন্দ হইয়া গেল। স্নানের জন্য একখানি সংকীর্ণ কামরা আছে। বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, বেশ জল পাওয়া যায় তো? তিনি বলিলেন, ওঃ খুব তোড় আছে দেখবেন। একেবারে চারটে চড়াইপাখী ভেসে যায়, এমন তোড়। অতএব জলের বেগ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। যা'ক, বাড়ির মালিক লোকটি ভাল, কেবল দোষ যে দেখা হইলেই ব্যবসায়ে তুর্দিনের সম্বন্ধে গল্প করিতে বসেন।

এই সংকীর্ণ গলিটির মধ্যে বাস করিতেছি। বিকালে কাজকর্ম

সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া কেমন মনটা খারাপ হইয়া গেল। পাশের বাড়ির ছাদের উপর দিয়া আকাশের একটি টুকরা দেখা যায়, তাহাতে সূর্যাস্তের একটু লাল আভা দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট হাঁটিলেই গঙ্গার ধারে পৌঁছানো যায়, সেই দিকেই হাঁটিতে লাগিলাম। অনেকেই চলিয়াছেন দেখিলাম। পথের উপরে গাড়ি-ঘোড়ার বিশেষ বালাই নাই, পরমানন্দে কতকগুলি গাভী ও বলীবর্দ মিলিয়া পথ অধিকার করিয়া আছে। তাহার মধ্যে কেহ পরম স্নেহে অপরের দেহ চাটিতেছে, কেহ বা চোখ বুজিয়া জাবর কাটিতেছে। দুইটি বাছুর আচম্বিতে বৃদ্ধদের দল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং পরস্পরের শৃঙ্গহীন মাথা ঠেকাইয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিল। একটি নিরীহ গর্দভ পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। এক পাল স্কুলের ছেলে দল বাঁধিয়া এক দিস্তা কাগজ কিনিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, তাহারা সেই কাগজের বাণ্ডিল দিয়া গর্দভের পিঠে ঘা দুই তিন বসাইয়া দিল। গর্দভটি যেমন ছিল তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল প্রতিবাদ স্বরূপ একবার কান দুইটি নাড়িল, বালকের দল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

পশ্চিম আকাশে তেতলা চারতলা বাড়ি এবং ইলেক্ট্রিকের থামের মাথা ডিঙ্গাইয়া দূরে মেঘের পুঞ্জ ও সূর্যালোকের লাল আভা দেখিতে পাইলাম। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন উপরের বাতাসের জন্য হাঁপাইয়া ওঠে, আমার মনও তেমনই এই ইট ও পাথরের স্তূপ লঙ্ঘন করিয়া মুক্তির জন্য হাঁপাইতে লাগিল।

অবশেষে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এতক্ষণে দূরের রূপ দেখিতে পাইলাম। সারা দিনমান চোখের দৃষ্টি রাস্তার দুই ধারে দেওয়াল হইতে দেওয়ালে ঠোকর খাইয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। সবই

কাছের জিনিস। গঙ্গার ধারে আসিয়া বাঁচিয়া গেলাম। দূর হইতে সুদূরের অস্পষ্ট জিনিস দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। হউক তাহা পাটকলের চিমনি, তবু তো দূরের জিনিস গঙ্গার বক্ষে জেলেদের ডিঙ্গি ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সুঠাম রেখায় ও শান্ত অথচ ক্ষিপ্র গতিতে মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

দেখিলাম, শুধু আমি নয়, বহু মানুষই আমার মত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসিয়াছে। কেহ ঘাটের সিঁড়ির উপরে বসিয়া আছে, কেহ শুধু গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মুখে আনন্দ বা নিরাশা কিছুই নাই, শুধু বালকের মত চাহিয়াই আছে। কোথাও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘাটের সিঁড়িতে ওঠা-নামা করিয়া খেলিতেছে। একজন বৃদ্ধ শুধু-পায়ে, গায়ে কোট পরিয়া জপ করিতেছিলেন। বৃদ্ধকে একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার চোখ মুদ্রিত, কপোলে জলের বিন্দু, একটি বিন্দু গড়াইয়া নাকের ডগায় স্থির হইয়া রহিয়াছে, ক্ষিপ্র অঙ্গুলিসঞ্চালনে করমালায় জপসাধনা করিতেছেন। হাত কাঁপিতেছে, যেন অন্তরের বেদনায় অধীর হইয়া তিনি জোর করিয়া জপ সমাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার জপ শেষ হইল। তিনি তখনও চক্ষু মুদিয়া পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া কপালে হাত তুলিয়া সুদীর্ঘ প্রণাম করিতে লাগিলেন। যেন চতুর্দিকের দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তিনি তাহাদের প্রসাদে কোনও রকমে ফাঁকে ফাঁকে একটু বাঁচিয়া থাকিতে চান।

উপরে আকাশ তখন ম্লান হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম দিগন্তে মেঘের শেষ কয়েকটি ক্ষীণ রেখায় তখনও রক্তবর্ণের আভাস রহিয়াছে। ঊর্ধ্বে বিচ্ছিন্ন মেঘের পুঞ্জ ধীরে ধীরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অচঞ্চল

গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া সবই বড়, সবই বিশাল, সবই সুদূর মনে হইতে লাগিল।

মানুষের সুখ, মানুষের দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম সকল মানুষই গঙ্গার ধারে মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া প্রকৃতির সহিত সঙ্গ করিতে আসিয়াছে। পুরানো বাড়ির ফাটলের মধ্যে আগাছা জন্মাইয়া যেমন আলোর দিকে, আকাশের অভিমুখে গ্রীবা বাড়াইয়া দেয়, ইহারাও সকলে তেমনই করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ প্রকৃতির শান্ত সুন্দর রূপে, তাহার বিস্তারে বিশালতায় অবগাহন করিতেছে। কেহ বা অন্তরে বেদনার আঘাতে মুদ্রিতনয়নে হৃদয়ের মধ্যে কল্পনার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করাইবার প্রয়াসে ক্ষিপ্তের মত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে।

আমার মন শান্ত হইয়া গেল, কিন্তু সেই বৃদ্ধের জন্য মনের কোণে একটু বিষাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বসন্ত

রেলে চড়িয়া চলিয়াছি। প্রভাতে ছোটনাগপুরের অসমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। খোলা মাঠ উঁচু-নীচু হইয়া যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ন্যাড়া পাহাড়। এক রূপ লইয়া প্রথমে দেখা দেয়, রেলের তীব্র গতির সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে তাহার রূপ বদলাইয়া যায়। অবশেষে যখন আমরা দূরে চলিয়া যাই তখন তাহার রূপ আর বেশি বদলায় না, শুধু বর্ণ উত্তরোত্তর নিষ্প্রভ হইয়া যায়। রেলের বেঞ্চিতে বসিয়া এই সকল দৃশ্য দেখিতেছি।

ছোট ছোট নদীর সাঁকোর উপর দিয়া রেলগাড়ি শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীতে জল নাই। বৈশাখের খর রৌদ্রে বালি ও পাথর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের নারীরা উজ্জ্বল লালপাড় শাড়ি পরিয়া বালি খুঁড়িয়া কলসীতে জল ভরিয়া লইতেছে।

ধূসর মাঠের উপর শীর্ণকায় মহিষের পাল চরিয়া বেড়াইতেছে। জল নাই, ঘাস নাই, তাহাদের বর্ণের উজ্জ্বলতা নাই। পৃথিবীসুদ্ধ যেন মলিন হইয়া আছে।

কিন্তু প্রকৃতির আরও একটি রূপ সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। পলাশের গাছে নূতন পাতা ধরিয়াছে, শালের গাছ কচি পাতায় ভরিয়া গিয়াছে। কুড়চির ঝোপে স্তবকে স্তবকে সাদা ফুলের শোভা ধরিয়াছে। গ্রামের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ার শাখায় যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া আমাদের গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। বসন্তের সবুজ পাতায় যেন মনের মধ্যে রং ধরাইয়া দিল। রাখাল

বালকেরা ছুটিয়া আসিয়া রেলের লাইনের পাশে দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একজন অশ্লীল ভঙ্গী সহকারে যাত্রীদের বিদ্রূপ করিল, দুই চার জন হাতছানি দিয়া কোলাহল করিতে করিতে আমাদিগকে ডাকিতে লাগিল। একজন রমণী ঘুমন্ত শিশুকে রেলগাড়ি দেখাইবে বলিয়া হাসিভরা মুখে তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিল। চলমান বস্তুকে সকলেই ভালবাসে। গতি সকলেরই ভাল লাগে, তাহার স্পর্শে এক একজনের মনে এক এক প্রকারের ঢেউ বহিয়া যায়। যে বালকটি অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহার কথা মনে পড়ায় হাসিতে লাগিলাম।

রেল পথ বাহিয়া চলিয়াছে। মাঠের মাঝে একটি পুরানো শালবৃক্ষ একা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার বৃদ্ধ বলিষ্ঠ দেহ কালের আঘাতে ঋজুভাবে বাড়িতে পায় নাই, স্থানে স্থানে গ্রন্থিজটিল হইয়া গিয়াছে। দেহের বর্ণ কালো, বহু বৎসরের শীত ও গ্রীষ্মের স্পর্শে তাহাকে মলিন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই দেহের সকল জীর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার শাখায় শাখায় সবুজ পাতার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই বর্ণের প্রভাবে বৃক্ষের অন্তর পর্যন্ত যেন আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছে। শীতের বিগত দিবস তাহাকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। দীর্ঘ জীবনের ভার তাহার হৃদয়কে ক্ষণেকের জন্য যেন পঙ্গু করিয়াছিল। কিন্তু আজ বসন্তের অন্তে বৈশাখের আবাহনে তাহার সকল গ্লানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

এই তো বসন্তের বাণী। দিবসের ধূলায় যখন আমার অন্তর ধূসর হইয়া আসিতেছে তখন সেই মলিনতাকে পরাহত করিয়া আবার বসন্ত আসিবে, জীবনে আবার নবপল্লবের সমারোহ দেখা দিবে। অন্তরের মধ্যে আমি সেই ধ্বনি আজ শুনিতে পাইতেছি।

১৪ই মাঘ—কাল সাঁওতালদের পরব। সারাদিন নাচগান হইবে, মেলা বসিবে। ইতিমধ্যে ধলভূম পরগনা হইতে মেলার জন্য অনেক দোকানদার আসিয়াছে দুইটি নাগরদোলা খাটানো হইয়াছে, কিন্তু লোকজন এখনও পর্যন্ত বিশেষ জমে নাই। কাল সকাল হইতেই নাকি সাঁওতালেরা দলে দলে আসিবে। রাত্রে নাচের সময় যে যাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহার কপালে হঠাৎ সিঁদুরের ফোঁটা নয়তো এক মুঠা ধূলি দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিবে—ইহা নাকি সাঁওতাল সমাজের একটি প্রথা। কন্যাপক্ষের গ্রামবাসিগণ বরকে ধরিয়া বিষম প্রহার করিবে, তাহার পর বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা হইবে। সবটাই সাজানো ব্যাপার। সিঁদুর দিবার আগে বর ও কন্যা নিশ্চয়ই পরস্পরের সম্মতি লইয়াই রাখে। কিন্তু গ্রামবাসীর প্রহার বড় খাঁটি জিনিস, উহার মধ্যে কিছুমাত্র ভেজাল নাই। মার খাইতে প্রস্তুত থাকিলে তবে কন্যারত্ন লাভ হইবে। লাভ বেশি বটে তবে দামও কিছু বেশি।

১৫ই মাঘ—সকাল হইতে কাতারে কাতারে সাঁওতাল নরনারী আগমন করিতেছে। সকলে নূতন কাপড় জামা ও শাড়ি সঙ্গে আনিয়াছে এবং গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া সাজসজ্জা করিতেছে। বাঁশের চোঙ্গায় তেল ও পাতায় মোড়া সাবান আনিয়াছে। তাহা ছাড়া পুঁটুলির মধ্যে নূতন পোষাক, নানাবিধ গহনা প্রভৃতিও রহিয়াছে। পুরুষেরা মাদল ঢাক বাঁশি আনিয়া সেগুলিকে বাজাইয়া দেখিতেছে এবং মেয়েরা

পরস্পরের প্রসাধনে সহায়তা করিতেছে। মেয়েদের গলায় গান লাগিয়াই রহিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে তাহারা সম্মিলিত কণ্ঠে এক আধ কলি গান ধরিতেছে।

অপরাহ্ণের সময়ে হাটতলায় মেলা বেশ জমিয়া উঠিল। বাজনার শব্দ ঘনীভূত হইয়া উঠিলে নাচ দেখিতে গেলাম। সকল মেয়ের মুখে হাসি। সবাই নিজের রুচিমত সাজসজ্জা করিয়া দলবদ্ধভাবে নৃত্য করিতেছে। হাড়িয়ার দোকানে আজ অসংখ্য খরিদ্দার, সকলে পাতার ঠোঙ্গায় মদ্যপান করিতেছে।

তিনজন যুবতী নাগরদোলায় চাপিবার জন্য পয়সা দিল এবং বেশ গুছাইয়া তাহার মধ্যে বসিল। জায়গা অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাই তাহা-দিগকে খুব ঠেসাঠেসি করিয়া বসিতে হইল। একে একে নাগরদোলার অপর জায়গাগুলি ভর্তি হইলে তাহা সবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী তিনজন সম্মিলিত কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল। নাগরদোলা কর্কশ শব্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সমস্ত দোষ ছাপাইয়া যুবতীগণের দীর্ঘ টান দেওয়া সুর বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। দোলার এক দিক যখন হু হু শব্দে নামিয়া আসে তখন ভয়েই হউক বা আনন্দের শিহরণেই হউক, যুবতীগণের চোখ যেন জ্বলিয়া ওঠে, কণ্ঠের সুরে ক্ষণেকের জন্য তীব্রতার আভাস পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ এই দৃশ্য উপভোগ করিয়া অন্যত্র সরিয়া গেলাম।

ঘন ভিড়ের মধ্যে নাচ চলিয়াছে, মাদল বাজিতেছে। একদল যুবক ও যুবতী সবেমাত্র পূর্ণপাত্র মদ্য পান করিয়া দর্শকগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অল্পক্ষণ পরেই নর্তকদলের হাত ধরাধরি করিয়া এক দীর্ঘ শ্রেণী বাঁধিয়া নাচিতে লাগিল। পার্বত্য ঝরনার জল যেমন নদীর স্রোতের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, ইহারাও তেমনি পূর্ববর্তী

নর্তকগণের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেল। বাদকগণের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল। তাহার মাথায় পাগড়ি, গায়ে একটি জীর্ণ কোট, কটিতে কৌপীনের মত বস্ত্র আর চোখে মাদকতা ভরা। সেও অবশ অঙ্গে নাচিতে লাগিল। যুবকেরা উদ্দাম অঙ্গভঙ্গী-সহকারে নৃত্য করিতেছিল। বৃদ্ধ তাহাদের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মাদকতার জন্যই হউক বা বার্ধক্যের জন্যই হউক, তাহার নৃত্যে সে তেজ ছিল না। তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না, আনন্দসম্ভোগের কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষ্য করিলাম না।

বিপুল বিক্রমে মাদল এবং নাকাড়ার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। চারিদিক ধূলায় সমাচ্ছন্ন। গানে কোলাহলে জনতার নিষ্পেষণে যেন আনন্দের তাণ্ডব রচিত হইয়াছে। কিন্তু আমার মন কেমন খারাপ হইয়া গেল। বহুকাল এমন সম্মিলিত আনন্দসম্ভোগ দেখি নাই। আর আমাদের সমাজে তো ইহার ক্ষেত্রও নাই। মাদল এবং নাকাড়ার ডিমডিম শব্দে বুকের ভিতর গুরু গুরু রবে কম্পিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিতে লাগিল। বর্ষার জলধারা নামিয়া আসিলে পার্বত্য নদীর স্বচ্ছ জল যেমন হঠাৎ গেরুয়া রঙে ঘোলা হইয়া ওঠে, সাঁওতালদের আজিকার নাচও আমার নিকট তেমনই মনে হইতেছিল। আর সেই নদীর জলে ছিন্নপত্র যেমনভাবে ভাসিয়া বেড়ায়, আমার অবস্থাও তেমনই হইয়াছিল। ছিন্ন শুষ্ক পত্র জলের উন্মাদ স্রোতে কখনও ভাসিয়া ওঠে, কখনও নীচে অদৃশ্য হইয়া যায়, তবু যেমন স্রোত হইতে তাহা পৃথক, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। চারিদিকে আনন্দের স্রোত, আমার শরীর তাহার ডিমডিম রবে কম্পিত হইতেছে, কিন্তু মনের মধ্যে আমার বিষণ্ণতার সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল।

উৎসবের প্রাঙ্গণ হইতে ফিরিয়া চলিলাম। অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হইল। দূর হইতে মাদলের শব্দ তখনও ভাসিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আমার আর সেখানে থাকিবার ইচ্ছা রহিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মাদলের শব্দ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। চারিদিকে অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের রজনী, দূরে কেবল নৃত্যবাসরের উপরে বৃক্ষপত্রে আলোর ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাত্রি যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন হঠাৎ মনে পড়িল, সাঁওতাল যুবকেরা আজ রাত্রে তাহাদের প্রেয়সীর মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা দিবে। মনে হইল, গিয়া দেখি, যদি কোথাও এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাই।

অন্ধকারের মধ্যে চলিতে লাগিলাম। সাবধানে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর মদ্যবিপণির নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি কয়েকজন যুবক ও যুবতী সম্মিলিতভাবে মদ্যপান করিতেছে, তাহাদের সকলের মুখে আনন্দ, পরস্পরকে পানপাত্র আগাইয়া দিতেছে। এ চজন মদ্যপ অত্যধিক মদ্যপান করিয়া পথের ধারে বসিয়া কি যেন বলিতেছিল। অন্ধকারে ঠাহর পাইলাম না, তাহার পর বুঝিতে পারিলাম যে সে সকলের অভিমুখে ফিরিয়া পথের সামনে প্রস্রাব করিতেছে এবং মদ্য বিক্রেতাকে গালি দিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, তিন চার জন পুরুষ মদ্যপানে অবশ হইয়া মাটিতে গড়াইতেছে। ইহার মধ্যেও কিন্তু সাঁওতাল যুবতীগণ নিজেদের সম্ভ্রম হারায় নাই। তাহারা যথাসম্ভব শোভনভাবে নাচে এবং গানে যোগ দিতেছিল, অথবা পান কিনিয়া ঠোঁট ও মুখ রাঙা করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল।

বর্ষায় নদীর জল ঘোলা হইয়া ওঠে। ইহাদেরও আনন্দের স্রোত ঘোলা হইয়া উঠিয়াছিল। মনের তলদেশে যত সুপ্ত তামসিকতা সঞ্চিত

ছিল, সেগুলি স্রোতের তাড়নায় আজ যেন ভাসিয়া উঠিতেছে। এই তমসার আঘাতে আমার অন্তঃকরণ পীড়িত হইয়া উঠিল। আমি উৎসবের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া গহন অন্ধকারের মধ্যে শালের বনপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ব্যাপিয়া পদচারণ করিতে লাগিলাম।

মনের ছায়ায় আমার মানসী প্রিয়ার মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। আমি যেন উৎসবের প্রাঙ্গণে ধীর পদবিক্ষেপে আনন্দের বহুবিধ মূর্তি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। অপরাহ্নে চক্রদোলায় সেই তিনজন যুবতী, বৃদ্ধের অবশ নৃত্যভঙ্গী,—পটের পর পটের মত চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল, মাদল এবং নাকাড়ার ডিমডিম শব্দের স্মৃতিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আমার গায়ের পাশে একজনের নিবিড় অস্তিত্বের অনুভূতি লাভ করিলাম। দেখিলাম, আমার সঙ্গে আমার মানসী প্রিয়াও এই সকল দৃশ্য নিবিষ্ট মনে দেখিতেছেন। তাঁহার হাত আমার হাতের মধ্যে আবদ্ধ। আমি নীচু হইয়া পথ হইতে এক মুঠা ধূলা কুড়াইয়া তাঁহার কপালে সন্ন্যাসীদের ভস্মলেপের মত মাখাইয়া দিলাম। হঠাৎ নিবিড় উজ্জ্বল আনন্দে প্রিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথার কালো চুলের আবেষ্টনের মধ্যে শুধু দুটি চোখের উজ্জ্বলতা দেখিতে পাইলাম। ওষ্ঠের প্রতি চাহিয়া দেখি নাই, কিন্তু আমার সমগ্র সত্তা দিয়া অনুভব করিতেছিলাম যে ওষ্ঠপ্রান্তে অপ্রকাশিত কলহাস্য যেন টলটল করিতেছে।

দীর্ঘ শালের বন অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। কোন একটি বৃক্ষের অন্তরালে অন্ধকারের আবরণের মধ্যে একটি পেচক ডাকিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠে কোনও চঞ্চলতা নাই। এত মানুষ নাচিতেছে, গান

গাহিতেছে, সে সব যেন ক্ষণেকের মধ্যে এই পেচকের প্রয়োজনসঞ্জাত শব্দের আঘাতে তুচ্ছ সামগ্রীতে পরিণত হইয়া গেল।

বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু প্রিয়ার সেই উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, সেই ফিরিয়া চাওয়া, সেই হাসি বার বার আমার হৃদয়মধ্যে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর মত আনন্দ বিকিরণ করিতে লাগিল। পানশালায় সাঁওতালদের যে কদর্যতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

১৬ই মাঘ—সকালের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাছের উপরে একটি ঘুঘু দীর্ঘ বিলম্বিত স্বরে আপন মনে ডাকিয়া চলিয়াছে। মাদলের বাজনা এখনও শোনা যাইতেছে, কিন্তু তাহার তেজ যেন কমিয়া আসিয়াছে। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, ততই দলে দলে সাঁওতালগণ স্বীয় গ্রামের অভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

আমি সঙ্গে একজন সাথী লইয়া নদীর পরপারে পাহাড়ে কোন্ কোন্ পাথর আছে তাহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। হাতে হাতুড়ি, কাঁধে ঝোলা এবং একটি দূরবীক্ষণ ও অপর কয়েকটি যন্ত্র। নিজের কাজে চলিয়া গেলাম। সারা বেলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় দ্বিপ্রহর একটার সময়ে পাহাড় ছাড়িয়া আবার গ্রামের পথ ধরিলাম। সেই পথে কয়েকজন সাঁওতাল যুবক এবং যুবতী ফিরিতেছিল। তাহাদের কী আনন্দ, কী উচ্ছলতা! সকলে হয় গান গাহিতে গাহিতে, নয়তো গল্প করিতে করিতে ফিরিয়া চলিয়াছে। একটি বালিকা প্রচুর অঙ্গভঙ্গী-সহকারে দেখাইয়া দিল, কেমন ভাবে নাগরদোলা তাহাকে হু—স্ করিয়া নীচ হইতে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার সাথীরা অমনই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। অপর একটি দল কিছু অন্তর দিয়া ক্ষেতের

আল ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহারা সাঁওতালীর পরিবর্তে একখানি বাঙলা গান গাহিতেছিল—

রাজা—র বা– গানে আজি ফুল তুলি—তে—

রাজা—র বা—গানে আজি ফুল তুলি—তে—

গানটি বাঙলা কিন্তু সুরটি সাঁওতালী, তাই গান বড় মিষ্ট লাগিল।

আমিও অন্যমনস্কভাবে হাতের হাতুড়িটা আরও চাপিয়া ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কাল রাত্রে প্রিয়ার মুখচ্ছবি দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা আবার আমার মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু শালবনের নিবিড় কালো অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে যেমন ভাবে পাইয়াছিলাম, আজ উৎসবের অবসানে দিনের আলোয় সে মূর্তি তেমন ভাবে আমার হৃদয়কে আন্দোলিত করিল না। সেই ছবি যেন খানিক দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার মাধুর্য কমে নাই, কিন্তু তাহার নিবিড়তা, হৃদয়কে চঞ্চল করিবার ক্ষমতা, যেন দূরত্বের জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

TRAINING COLLEGE
BANIPUR

সমুদ্র

সমুদ্র। কত রূপেই না বার বার ইহাকে দেখিয়াছি! সংসারের দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে আমার চিত্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই জনবিরল সমুদ্রের উপকূলে শুধু ঊর্মিমালার দিকে চাহিয়া থাকিতে আজ এত ভাল লাগিতেছে। ঢেউয়ের পরে ঢেউ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতেছে, কূলের বালুরাশির উপর ধাবিত হইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে, আবার তাহার পিছনে ঢেউ আসিতেছে, আবার পূর্বের মত বিলীন হইয়া যাইতেছে। বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ এমনই একই রূপে, একই সুরে সমুদ্রের বক্ষে জলতরঙ্গের লীলা চলিতেছে। তাহার শ্রান্তি নাই, ভুল নাই, বিরাম নাই—এমনই চলিয়াছে।

কংগ্রেসের কর্মপ্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেকের সঙ্গে কাজ করিয়াছি, কাজ করিতে ভালও লাগিয়াছে। কিন্তু সময়ে সময়ে চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। কর্মীগণের মধ্যে পরস্পরের দোষ-ত্রুটি সর্বজনসমক্ষে আলোচনা করিয়া ধূলার ধূমে পরস্পরকে ধূসরিত করিবার ইচ্ছা দেখিয়াছি, আবার সেই ধূমের অন্তরালে নিজের যশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, কর্মবিমুখতাকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টার সন্ধান পাইয়াছি। বাহিরে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের হৃদয়ে শুধু শোষকের প্রতি ক্রোধ এবং শোষিতের প্রতি সহানুভূতি বিরাজমান, কিন্তু ভিতরে যে বেগের বশে তাঁহারা চালিত হইতেছেন, সেই তমসার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া আমার চিত্ত দুঃখিত হইয়াছে। মনে হইয়াছে, ইহাদের মোহের আবরণ বুদ্ধির দ্বারা ভেদ করিতে পারিলেই হয়তো সব

1797 ৩/17

ঠিক হইয়া যাইবে, একবার কেবল দেখাইয়া দিই—কোথায় ভুল হইতেছে। কিন্তু নানা তর্ক ও দীর্ঘ আলোচনার ফলেও কোলাহল এবং দ্বন্দ্বের বেগ প্রশমিত হয় নাই। তাঁহাদের আচরণের তরঙ্গ-তাড়নায় সাধারণ জনগণের চিত্ত আরও বিভ্রান্ত হইয়াছে, সংসার হইতে দুঃখ-নিবারণের চিন্তা ক্ষণেকের জন্য আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আজ সমুদ্রের কূলে বসিয়া সেই কথা ভাবিতেছি।—কেন মানুষ এত অন্ধ হয়? কেন তাহার দৃষ্টি লক্ষ্য হইতে অপসারিত হয়? এই জড়তা হইতে কি মুক্তি নাই?

দূর চক্রবালরেখার দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। কাছে কতই না ঢেউ দেখা যাইতেছে! তাহাদের সশব্দ আস্ফালনে সমুদ্রের উপকূল যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। আরও দূরে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে। ঐ যে সাদা পাখিগুলি নীল জলের মধ্যে খাদ্যের সন্ধানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের কখনও দেখা যায়, কখনও যায় না। এত ঢেউ, সমুদ্রবক্ষে একটি কণাও শান্ত হইয়া নাই; সর্বত্র চঞ্চল, ক্ষণেকের বিশ্রামও কোনও জলবিন্দুর ভাগ্যে ঘটে না। অথচ চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল, অসংখ্য ঢেউ বটে, কিন্তু দূর চক্রবালরেখার ঋজু প্রান্তকে ইহারা সকলে মিলিয়া তো কণামাত্রও বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। সব ঢেউগুলি ঐ চক্রবালরেখার নিকটে পরাহত হইয়া যাইতেছে, তাহার স্থির প্রশান্ত শক্তির কাছে ইহাদের সমস্ত সম্মিলিত বিক্ষোভ, সকল উগ্রতা যেন হার মানিতেছে।

চাহিয়া চাহিয়া আমারও মনে এমনই একটি শান্ত ভাবের উদয় হইতেছে। কাল যাহাদের স্বার্থ-সংঘাতে ব্যথিত হইয়াছিলাম, যাহাদের অনাচারে হৃদয়ের সমস্ত ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ প্রভাতের সূর্যকরোজ্জ্বল নীল জলরাশির পাশে বসিয়া মনে হইতেছে, তাহারাও

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date ....
Accn. No... 9370

তো এই সকল ঢেউয়ের মত নগণ্য, শুধু সমুদ্রের উপরের স্তরেই আবদ্ধ। তাহারা স্বার্থের বশে, ক্ষমতার লালসায় ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে। কত শব্দ করিতেছে, পরস্পরের সংঘাতে কতই না ফেনরাশি মথিত করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু সমগ্র মানবজনসমুদ্রে তাহাদের স্থান কোথায় ? মানুষের ইতিহাসের বিরাট পরিধির মধ্যে তাহারা কতটুকুই বা বিক্ষোভ সৃজন করিতে পারিয়াছে ? সমগ্র ইতিহাস বিশ্বেরই মত বিশাল চক্রবালরেখার দ্বারা সীমায়িত, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবন-মরণের কীই বা দাম, তাহার সমস্ত আস্ফালনের কতটুকুই বা মূল্য ?

* * *

অথচ সমুদ্রকে শুধু যে এই একটি রূপেই দেখিয়াছি তাহা নহে। আমি মানুষ, নিজের জীবনে প্রশান্ত দৃষ্টির সন্ধানে আজ সমুদ্রের মধ্যে বিরাট অচঞ্চল রূপের সন্ধান করিতেছি, ইহাই সবটুকু নহে। আজ দিনের আলোয় যখন চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে, নীল আকাশের গায়ে তুষারশুভ্র পাখির শ্রেণী যখন হেলায় ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছে, তখন সমুদ্রের আরও একটি রূপের কথা স্মৃতির পথে উদিত হইতেছে। কিন্তু ধারণায় তাহা যেন আজ ঠাঁই পাইতেছে না। বহু বৎসর পূর্বে রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রের আরও একটি রূপ দেখিয়াছিলাম। তখন ভরা আষাঢ় মাস। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সেদিন আকাশ কালো মেঘপুঞ্জের ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, বিপুল বেগে ঝড় উঠিয়াছিল এবং মুষলধারায় বৃষ্টি ধরার উপরে নামিয়া আসিতেছিল। ঘরের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিলাম। দমকা হাওয়ার তাড়নায় কপাট খুলিয়া সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, জানালা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিলাম, জলের কণা যেন ছুঁচের মত আসিয়া বিঁধিতেছে।

হঠাৎ ঘরের বাহির হইয়া পড়িবার বাসনা হইল। গায়ে একখানি চাদর জড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! ঝড়ের বেগে মাথা নীচু করিয়া চলিতে লাগিলাম। চোখের সামনে বৃষ্টিধারাকে আড়াল করিয়া পথ চিনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারই আলোয় সামনে শুধু তীরের মত বেগে বৃষ্টির কণাগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে, দেখিতে পাইতেছিলাম।

সমুদ্রের কূলে পৌছিয়া মনে হইল, হাঁ, দেখিবার মত দৃশ্য বটে। আকাশের মেঘে, সমুদ্রের কালো জলে একাকার হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দিনে বেলাভূমির নিকটেই শুধু ঢেউয়ের শ্রেণী ভাঙিয়া পড়ে, তাহাদের ফেনরাশি ছুটিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু আজ অন্ধকারেও অনুভব করিলাম যে, শুধু সমুদ্রের অঞ্চল নয়, তাহার সমগ্র বিস্তীর্ণ বক্ষদেশ যেন মুহূর্তে মুহূর্তে মথিত হইয়া উঠিতেছে। ঢেউয়ের পরে ঢেউ সহস্রশীর্ষ ফণার মত উন্মত্ত ভাবে বেলাভূমির অভিমুখে ধাইয়া আসিতেছে। আর কী শব্দ! কী নিবিড় সেই অন্ধকার! সমস্ত দেহ যেন তাহার ছটায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল।

বেলাভূমির উপরে একখানি পরিত্যক্ত নৌকার আড়ালে বসিয়া বহুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম—মনে পড়ে। নিকটে কোনও গৃহস্থের বাড়িতে একটি কুকুর হয়তো ভয়ের কিছু দেখিতে পাইয়া প্রাণপণ শব্দে চীৎকার করিতেছিল। সমুদ্রের একটানা দুর্জয় গম্ভীর শব্দ ভেদ করিয়া কুকুরের সেই ডাক কানে প্রবেশ করিয়াছিল—মনে পড়ে। আর তখন মনে হইয়াছিল, প্রকৃতির চারিদিকে প্রমত্ত বিপ্লব অথচ এই অবোধ জীবটি তাহার কিছুই অনুভব করিতেছে না।

নিজের ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে কোথায় কি ঘটিয়াছে তাহারই হিসাব-নিকাশ লইয়া এই মহামুহূর্তের মধ্যেও ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

* * *

এমনই করিয়া সমুদ্রের ঝড় ও সেই গুরু গুরু শব্দ একদিন আমার হৃদয়ের মধ্যে একটি মহত্ত্বের ভাব বহিয়া আনিয়াছিল। আজ তাহার দিগন্তপ্রসারিত শান্ত রূপ হৃদয়কে প্রশান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

কিন্তু আজ আরও একটি কথা আমার মনে হইতেছে, সেদিন ঝড়ের রাতে তাহা তো মনে হয় নাই! মনে হইতেছে, সমুদ্র তো জড়। তাহার চিত্ত কোথায়? তাহার প্রাণ নাই, তাহার উপরে শান্ত, শীতল, উগ্র, গম্ভীর কত রূপই তো দিনের পর দিন খেলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের নিজের কাছে তাহার কীই বা মূল্য থাকিতে পারে? তাহার স্মৃতি নাই, বেদনা নাই। কিন্তু আমি মানুষ, হৃদয়ের এক একটি ভাবের আলোড়নে, সুরের সহিত সুর মিলাইয়া সমুদ্রের নব নব রূপকে বাঁধিয়া রাখিতেছি, আমার মনের মন্ত্রস্পর্শের দ্বারাই সমুদ্র আজ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের মধ্যে, নিজের রঙে রঙ মিলাইয়া প্রকৃতির পটভূমিতে নিজের জন্য অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ সৃজন করিয়া লইতেছি।

ইহাই কি সত্য নয় যে জড়প্রকৃতি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মত রূপ-হীন, বেদনাহীন? আমার হৃদয় তাহাকে যে রূপ দেয় সেই রূপেই সে সাজিয়া উঠে—ইহাই কি তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা নয়?

মধ্যপ্রদেশে সুরগুজা ও যশপুর নামে যে দুইটি করদ রাজ্য আছে। তাহার সন্নিকটে বিহার প্রদেশের মধ্যে পালামৌ জেলার কয়েকটি পরগণা গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত। গাছের মধ্যে শাল, আসন, গাম্ভার প্রভৃতি বেশী; তাহা ছাড়া কোথাও কোথাও বিস্তীর্ণ পাহাড়ের দেহ বাহিয়া শুধু বাঁশের বন দেখা যায়। বাঁশের বন যে পাহাড়ের উপর হয়, সেখানে মাটির উপরে বেশী ঝোপ-জঙ্গল থাকে না। বাঁশঝাড়ের নীচে প্রায় পরিষ্কার থাকে, কেবল বাঁশের শুক্‌না পাতাই পড়িয়া থাকে। শালের বনে নীচে ঝোপ বেশী হয়। হাতে ধারাল কুঠার না থাকিলে পথ চলিতে পদে পদে বাধা পাইতে হয়।

এই সকল জঙ্গলের মধ্যে জীবজন্তুদের এক একটি এলাকা থাকে। পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট নদীনালা প্রায়ই দেখা যায়। বাঘেরা বনের ভিতর দিয়া চলাফেরা করিতে হইলে নদীপথ আশ্রয় করে। বাঘেরা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জানোয়ার। যেদিকে চোরকাঁটা সেদিকে তাহারা পারতপক্ষে যায় না। শূকর অথবা হরিণ মারিয়া খাইবার পর বাঘ সচরাচর নদীর জলে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে। এই জন্য বাঘেরা সচরাচর জলপথের কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়ায়। হরিণ বাঘের এই স্বভাব জানে বলিয়া বনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু ঘাসাল জমি দিয়া নিঃশব্দে চলাফেরা করে।

জীবজন্তু চলিয়া চলিয়া জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি পথ হইয়া যায়। মাঠের উপর দিয়া মানুষের পায়ে চলার পথে যেমন ঘাস মরিয়া একটা

দাগ হইয়া যায়, জঙ্গলেও কতকটা সেইরূপ হয়। দুইদিকে উচ্চ ঘাস এবং তাহার মাঝখান দিয়া একটি রেখা দেখা যায়, যেখানে সব ঘাস একদিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া থাকে। পদদলিত হইয়া ঘাসগুলি একেবারে মরিয়া যায় না বটে, তবে তাদের বৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়।

এমন জঙ্গলের ভিতর মাঝে মাঝে মানুষের বাস আছে। দুই ক্রোশ, তিন ক্রোশ অন্তরে এক একটি পার্বত্য গ্রাম। মানুষেরা সুবিধামত একটা পথ করিয়া লয়, নয়তো জঙ্গলের ভিতর জীবজন্তুর অনুসৃত পথকে আরও একটু সরল, আরও প্রশস্ত করিয়া লয়।

পালামৌ জেলায় যাহারা এই সব বনে বাস করে তাহারা প্রধানতঃ চাষ করিয়া থাকে। বন্য হাতী, মহিষ, হরিণ ও শূকরের হাত হইতে শস্যের অর্ধেক রক্ষা করিতে পারিলে ইহারা যথেষ্ট মনে করে। বাড়ির চারিদিকে অথবা গরুমহিষের বাথানের চারিদিকে উচ্চ শালের বেড়া দিয়া ইহারা বাস করে। তাহার ভিতর হইতেও কখন কখন বাঘ গরুবাছুর ধরিয়া লইয়া যায়। শস্যক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করিবার জন্য বেড়া দিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় না। সর্বদা সতর্ক হইয়া পাহারা দিতে হয়। চাষীরা উঁচু মাচা বাঁধিয়া তাহাতে শুইয়া থাকে এবং চারিদিকে গাছে এক একটা টিনের কানেস্তরা ও লাঠি বাঁধিয়া রাখে। এই সকল লাঠির সঙ্গে এমনভাবে দড়ি বাঁধা থাকে যে মাচায় শুইয়া দড়ি টানিলেই চতুর্দিকে গাছের টিন একসঙ্গে বাজিয়া উঠে। ইহাতে রাত্রে হরিণেরা ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

এমনি ভাবে সতত বন্যজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পাহাড়িয়ারা বাঁচিয়া থাকে। পাহাড়ে অনেক জাতি বাস করে। তাহাদের মধ্যে উরাওঁ একটি বিশিষ্ট জাতি। একবার পালামৌ জেলায় ধাওতাল উরাওঁ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। ধাওতাল গ্রামের মধ্যে

বেশ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল। তাহার নিজের গরুমহিষ ও চাষবাস বেশ ভালই ছিল। ধাওতাল খুব দীর্ঘকায় ছিল না বটে, কিন্তু তাহার দেহে খুব বল ছিল। বয়স ষাটেরও বেশী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও হাতের কুঠারের একঘায়ে সে তিন চার ইঞ্চি মোটা শালের চারা এক কোপে কাটিতে পারিত; সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা কাটিতে চার কোপ লাগিয়া যাইত।

ধাওতাল বেশী কথা কহিত না, তাহার চলন কতকটা ভাল্লুকের মতন ছিল। একটু হেলিয়া দুলিয়া বাঁ হাতে টাঙ্গি ঝুলাইয়া সে বনপথে যাতায়াত করিত। ভয় তাহার বিশেষ কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদিন একটি জঙ্গলের সংবাদ লইবার জন্য তাহাকে পাঠান হইয়াছিল। সে জঙ্গলে পূর্ববর্তী বৎসর একটি ছোট হাতীর পাল আসিয়াছিল। এ বৎসরও তাহারা সেখানে থাকিলে শিকারের অসুবিধা ঘটিবে ভাবিয়া ধাওতালকে পাঠান হইল। ধাওতাল বিনা বাক্যব্যয়ে দুইদিনের মত খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া একাই সেই গহন বনের উদ্দেশে রওনা হইয়া গেল। পথে এক গ্রাম হইতে মনবাহাল নামে অপর একজন শিকারীকে তাহার ডাকিয়া লইবার কথা ছিল।

তৃতীয় দিনে যখন ধাওতাল ফিরিয়া আসিল তখন মনবাহালের কাছে তাহার কার্যকলাপের বৃত্তান্ত শোনা গেল। মনবাহাল বলিল গত রাত্রে অন্ধকারের সময়ে তাহারা যেখানে আশ্রয় লইয়াছিল সেখানে পাশে একটি সংকীর্ণ গুহার মধ্যে হঠাৎ তাহারা এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখিতে পায়। মনবাহাল কিছু ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ধাওতাল নির্বিবাদে হামাগুড়ি দিয়া গুহার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল। জন্তুটিও দেখাদেখি আরও পিছাইয়া গেল। কিছুক্ষণ আগুপিছু করিবার পর ধাওতাল বাহির হইয়া আসিলে জন্তুটি অত্যন্ত ভয় পাইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া

গেল। তখন দেখা গেল যে উহা কোনও ভয়াবহ জীব নয়, একটি সজারুমাত্র।

যাহাই হউক, মনবাহাল যখন গল্পটি বলিতেছিল, ধাওতাল তখন বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে তাহার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ ছিল না। কারণ জন্তুটি যদি চিতাবাঘও হয়, তবু গর্তের মধ্যে অমন বে-বাগে পড়িয়া সে কিছু করিতে পারিবে না। হয়তো কিছু করিত পারিত না একথা সত্য ; কিন্তু নিরাপদ জানিয়াই বা কয়জন লোক এরূপ অবস্থায় ভয়ের হাত এড়াইতে পারে ?

আমার যে আত্মীয়ের সঙ্গে পালামৌ জঙ্গলে গিয়াছিলাম, ভাল শিকারী বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি আছে। একদিন শিকারে ধাওতালও সঙ্গে ছিল এমন সময়ে একজনের অসাবধানতায় একটি বাঘ গুলি খাইয়া আহত হইয়া পলাইয়া গেল। জঙ্গলে বাঘকে জখম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া শিকারীদের রীতি নয়। এরূপ অবস্থায় তাহারা অত্যন্ত হিংস্র হইয়া উঠে এবং মানুষ দেখিলে অনিষ্ট না করিয়া ছাড়ে না।

অতএব আহত বাঘটিকে মারিবার জন্য শিকারীর দল তাহার পিছু লওয়া স্থির করিলেন। স্থির করিলেও সকলের সাহসে কুলাইল না। বন্দুকধারী দুএকজন অগ্রগামী হইলেন এবং ধাওতাল হাতের টাঙ্গি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। আহত বাঘের রক্ত ও পদচিহ্ন দেখিয়া স্থির হইল যে তাহার পেটে বা বুকে গুলি লাগে নাই, কেবলমাত্র একটি পা ভাঙিয়া গিয়াছে।

বনের ভিতর দিয়া বাঘের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যাওয়া অসাধারণ দক্ষতার ব্যাপার। শিকারীরা যাইবার সময়ে ধাওতালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধাওতাল, যদি বাঘ হঠাৎ আসে, তুমি পলাইবে না তো ?" ধাওতাল বলিল, "বাবু, তা কেমন করিয়া হইতে পারে ? তুমি ও

আমি দুইজনে পুবমুখে যাইতেছি। বাঘ যদি আসে তোমার মুখ পুবদিকে থাকিবে, আর আমার মুখ পশ্চিম দিকে হইবে, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে ?"

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল কতকগুলি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে বাঘ আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে সহসা যাওয়া কঠিন। ঠিক কোন্ পাথরের আড়ালে বাঘ আছে তাহা জানা না থাকায় শিকারীদের বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যখন সকলে এমনি ইতস্তত করিতেছেন, তখন ধাওতাল সম্মুখে একটি ছোট কেন্দ গাছ দেখিতে পাইয়া বলিল, "আমি ঐটিতে গিয়া উঠি। আমাকে দেখিয়া বাঘ যেমন লাফ দিয়া বাহির হইবে, আপনারা তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন।"

যেমন বলা, তেমনই কাজ। সাবধানে গাছটির কাছে গিয়া ধাওতাল উপরে চড়িতে লাগিল। কয়েক হাত চড়িয়াই সে বাঘটিকে দেখিতে পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দেখাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তখনও কিন্তু সে এত উপরে উঠে নাই যে বাঘ তাহাকে ধরিতে পারে না, তবু সঙ্গের শিকারীদের উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই সে এরূপ দুঃসাহসের কাজ করিল। বাঘ তাহার শব্দ শুনিবামাত্র দুরন্তবেগে তাহার দিকে লাফাইয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর গুলিতে সাংঘাতিক-ভাবে আহত হইয়া পুনরায় সে পড়িয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন আমরা লোকজন ডাকিয়া বাঘটিকে তাঁবুতে লইয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময়ে তাঁবুতে আগুনের ধারে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে ধাওতালকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা সব সময়ে এমন ভাবে বিপদের মধ্যে থাকে কেন ? জঙ্গলের বাহিরে কোনও গ্রামে, যেখানে আরও নিরাপদে চাষ-আবাদ করা যায়, সেখানে থাকলেই তো ভাল হয়। ধাওতাল আমার

কথায় হাসিয়া প্রশ্ন করিল, “বাবু, তোমাদের ওখানে কি মানুষ মরে না ?”

আমাকেও হাসিতে হইল বটে, কিন্তু ইহার কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।

বনের সংবাদ

ছেলেবেলায় আমার ধারণা ছিল যে বনের মধ্যে বাঘ ভাল্লুক বুঝি গাছের ফাঁকে ফাঁকে খুব ভিড় করিয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু যখন যথার্থই বড় বন দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিল, তখন দেখিলাম সত্যই যাহাকে অরণ্য বলা যায় তাহা আমাদের সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

সে যেন আর একটা রাজ্য। মানুষের জগতের সহিত তাহার কোনও যোগ নাই। চারিদিকে বিশাল বৃক্ষরাজি সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে; উপরে আকাশের আলো পত্ররাজির মধ্য দিয়া কোথাও বা দেখা যায়, কোথাও দেখা যায় না। এক একটি বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড প্রায় চল্লিশ হাত, পঞ্চাশ হাত সোজা উঠিয়া তবে উপরের দিকে ডালপালা মেলিয়া ধরিয়াছে। যে সকল গাছ বড় গাছের সঙ্গে জীবনযাত্রার যুদ্ধে পারিয়া উঠে না, তাহারা লতার আকারে বড় গাছের কাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হয়। আর সুবিধা পাইলে মূল গাছটিকে মারিয়া ফেলিতে ছাড়ে না; তাহার সব রস নিজের পুষ্টির জন্য টানিয়া লয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এই সকল রাক্ষুসে গাছের লতাপাতা এবং ফুলের বাহার শাল, আসন প্রভৃতি মহীরুহ অপেক্ষা অনেক বেশী। লতানে গাছগুলি পরের কাণ্ড আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পায় বলিয়া তাহাদের সকল শক্তি যেন নিজের অঙ্গশোভার জন্য ব্যয় করিতে পারে। পাতার বিস্তারে ও বৈচিত্র্যে তাহারা চক্ষে চমক লাগাইয়া দেয়। অথচ যাহাদের কাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া এই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সে সব গাছের এমন বাহার

কখনও হয় না। তাহাদের কাণ্ড শুধু পুরুষোচিত বীর্যের ভরে স্থির ঋজুভাবে আকাশের দিকে ঘন পত্ররাজি মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

গহন বন যেন একেবারে স্বতন্ত্র একটি জগৎ। মানুষ এখানে অপরাপর জীবেরই মত সামান্য জীব; বনদেবতার দয়ায় কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। বনের মধ্যে মানুষের চলাফেরা এত কম যে কোন স্থায়ী পথ সেখানে গড়িয়া উঠে না। হয়তো একজন কাঠুরিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য একটি পথ কাটিয়া যায়, এবং যাইবার সময়ে দুইপাশের গাছে কুঠারের আঘাতের চিহ্ন রাখিয়া দেয়। পরের মানুষেরা সেই আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া নিজেদের পথ বাছিয়া লয়।

ছোটনাগপুরে এমনই একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া যাইতে যাইতে একদিন দেখিলাম এক জায়গায় অনেকগুলি ছোট পাথর কে যেন স্তূপের মত সাজাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের সঙ্গে যে ব্যক্তি যাইতেছিল সে বলিল যে এদিক দিয়া মহাজনেরা বলদের পিঠে মাল বোঝাই করিয়া মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। গরুর গাড়িতেও এ পথে চলিবার কোন উপায় নাই। যাহারা যায় তাহারা সকলে এই জায়গায় বনদেবতার উদ্দেশে স্বহস্তে ঐ স্তূপের উপর আরও একখণ্ড পাথর ফেলিয়া দিয়া যায়।

বনের ভিতর মানুষের দর্শন এমনই দুর্লভ যে তবু মানুষের হাতে ছোঁড়া এক টুকরা পাথর দেখিয়াও পরের পথিক হৃদয়ে ভরসা পায়। এইরূপ কত শত বৎসর ধরিয়া এক অজ্ঞাত পথের পাশে কোন অখ্যাত বনদেবতার অর্ঘ্যবেদী গড়িয়া উঠিয়াছে।

একদিন কয়েক জন শিকারী বন্ধুর সঙ্গে শিকার দেখিতে গিয়াছিলাম। বনের একধার ঘিরিয়া কতকগুলি গাছের উপরে মাচা বাঁধা হইল এবং বহু দূর হইতে গ্রামের লোকজন কেরোসিনের টিন বাজাইয়া বনের জন্তুগুলিকে আমাদের মাচার শ্রেণীর দিকে হাঁকাইয়া আনিতে লাগিল। যে মাচায়

শিকারীরা বসিয়াছিলেন আমরা সে মাচায় বসি নাই। যে মাচার পাশে বাঘ আসিবার সম্ভাবনা ছিল না এমন একটি মাচায় আমার বন্ধু ও আমি, দুইজনে ছবি তুলিবার যাবতীয় সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া রহিলাম। আমাদের মতলব ছিল যে আমরা শুধু বনের জীবজন্তু দেখিব এবং যদি সম্ভব হয় তাহাদের ছবি তুলিব।

আমরা দুইজনে নিস্তব্ধ বনের মধ্যে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। চারিদিকে জীবজন্তুর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, পাতার মর্মর ধ্বনি ও ঝিল্লীরব ছাড়া আর প্রায় কিছুই শোনা যাইতেছিল না। ঝিল্লীরা অরণ্যের মধ্যে অবিশ্রাম ভাবে ডাকিয়া যায়। আমাদের কখনও মনে হইতেছিল ঝিল্লীরা একদিক হইতে ডাকিতেছে, কখনও বা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে। সত্যই একটি ঝিল্লী যখন ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন যেন তাহারই স্থান পূরণ করিবার জন্য অন্য কোনও বৃক্ষকোটর হইতে আর একটি ঝিল্লী সেই তান ধরিয়া লয়।

এমনিভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম হাঁকোয়ারা দূরে তাহাদের হাঁক শুরু করিয়াছে। তাহাদের কোলাহল প্রথমে দূর হইতে অতি ক্ষীণভাবে আসিতেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সে শব্দ আরও নিকটে ও আরও গাঢ় হইয়া আসিল। কিন্তু শব্দ আরম্ভ হইবা-মাত্র যে বনের জীবজন্তু চতুর্দিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করিল তাহা নহে। বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনও শব্দ শোনা যায় নাই। একাগ্রভাবে শুনিবার চেষ্টায় আমাদের শ্রবণশক্তি যেন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ হাঁকোয়াদের ডাক এবং ঝিল্লীরব ছাড়াও আমরা খস্ খস্ করিয়া একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই তাহা থামিয়া গেল। আমরা চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কোথাও কিছু নড়ে কিনা। এমন সময়ে দেখা গেল দু'তিনটি বেশ বড় হরিণ গাছপালার অন্তরালে স্থির

হইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। কোন্ দিক হইতে মানুষের আওয়াজ আসিতেছে তাহারা যেন তখনও ঠিক বুঝিতে পারে নাই, তাই কোন্ দিকে পলাইবে তাহা স্থির করে নাই। হাঁকোয়াদের শব্দ ক্রমে আরও কাছে আসিতে লাগিল, এবং হয়ত হঠাৎ বুঝিতে পারিয়া হরিণের ক্ষুদ্র দলটি নিমেষের মধ্যে আমাদের মাচার পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে অনেকক্ষণ আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। হাঁকোয়ারা আরও কাছে আসিতে লাগিল ; কিন্তু কোনও বাঘ বা ভাল্লুক দেখিতে না পাইয়া আমরা যেন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ একটি ভারি জন্তু সবেগে আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে এইরূপ আওয়াজ শোনা গেল। আমার সঙ্গী বন্ধুটি বলিলেন ইহা শম্বর বা অন্য কোন খুরবিশিষ্ট জন্তুর শব্দ নয়, বাঘ হইলেও হইতে পারে। আমরা এই সব ভাবিতেছি এমন সময়ে আমার বন্ধু হঠাৎ চুপি চুপি বলিলেন, "বাঘ।" তিনি যেদিকে দেখাইয়া দিলেন সেদিকে চাহিয়া দেখি যে সত্যই একটি পূর্ণকায় বলিষ্ঠ বাঘ আমাদের মাচা হইতে প্রায় কুড়ি হাত দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে যেন কি করিবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের উপর শিকারীদের নির্দেশ ছিল যে যদি বাঘ ভ্রমক্রমে আমাদের মাচার নিকটে আসে আমরা যেন খুব শব্দ করিয়া তাহাকে উল্টাদিকে ফিরাইয়া দিই। সেই নির্দেশমত আমার বন্ধুট হঠাৎ সশব্দে হাততালি দেওয়া আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম।

বাঘ এতক্ষণ আমাদের দেখে নাই। কিন্তু এবার শব্দ শুনিয়া উপরে চাহিতেই আমাদিগকে দেখিতে পাইল। তখন সহসা সে একটি হুঙ্কার দিল এবং দাঁত বাহির করিয়া আমাদের ভয় দেখাইবার চেষ্টা

করিল। যে কারণেই হউক আমরা ভয় পাওয়ার পরিবর্তে তুমুল বেগে হাততালি দিতে লাগিলাম। বাঘ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাহার পর সহসা উল্টাদিকে না গিয়া মাচার শ্রেণী ভেদ করিয়া তীরবেগে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। খুব ভাল ঘোড়া যেমন বেগে ছোটে, আমাদের মনে হইল বাঘ তাহার চেয়ে বেগে বনের বৃক্ষশ্রেণী ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন অবশ্য বাঘ শিকার হইল না। বাঘ দেখার আনন্দে আমি ক্যামেরার শাটারটি টিপিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যাহাই হউক, হাঁকোয়ারা ক্রমে আমাদের মাচার নিকটে পৌঁছিলে আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। হাঁকোয়াদের ভিতর একজন একটি সদ্যোজাত হরিণশিশু পাইয়াছিল। তাহার মা ভয় পাইয়া প্রথমেই পলাইয়াছিল বটে, কিন্তু শাবকটি কয়েকজন চলন্ত মানুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাদেরই সঙ্গ লইয়াছিল। তাহার চোখে ভয়ও ছিল না, বিস্ময়ও ছিল না। আমরা হরিণশিশুটিকে কোলে করিলাম, তাহাকে মাটিতে নামাইয়া রাখিলাম। সে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

তখন একজন গ্রামবাসী তাহাকে কোলে তুলিয়া কিছু দূরে গভীর বনে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে সন্ধ্যার পূর্বেই হরিণমাতা নিশ্চয় তাহার শাবককে খুঁজিয়া লইয়া যাইবে।

চইতা

রাঁচি হইতে হাজারিবাগ যাইবার পথে, সদর রাস্তা হইতে প্রায় সাত আট মাইল দূরে, বেড়মো নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের পাশে শালবনে আচ্ছন্ন পাহাড়, এবং তাহার কোলে পাথুরে চুনের একটি ক্ষুদ্র খনি। তাহার নিকটে একটি ক্ষুদ্রকায় পার্বত্য নদী বহিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময়ে উহা ঘোলা জলে ভরিয়া যায় এবং সময়ে সময়ে তীব্র স্রোতে পাশের দুই একটি পুরাতন শালবৃক্ষ ভাঙিয়া ফেলে; কিন্তু অন্য সময়ে নদীর শান্ত স্রোত কলরব করিতে করিতে নানা বর্ণের উপলখণ্ডকে আলোড়িত করিয়া বহিতে থাকে।

বেড়মো গ্রামে বেশী লোকের বাস নয়। তাহাদের মধ্যে চইতা নামে একজন লোক বাস করিত। সে পাথরের খাদে কুলির কাজ করিত এবং সামান্য রোজগারে সন্তুষ্ট থাকিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। সংসারে তাহার স্ত্রী এবং একটি ছোট্ট ভাই ভিন্ন আর কেহ ছিল না।

বেড়মো গ্রামের চুনখাদের মালিক আমার জনৈক বন্ধু ছিলেন। তিনি রাঁচিতেই বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কাজের তদারক করিবার জন্য সাইক্লে চড়িয়া বেড়মো যাতায়াত করিতেন। একবার আমি কার্যোপলক্ষে রাঁচি গিয়াছিলাম। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ আমার বন্ধুর নিকটে সংবাদ আসিল যে খনিতে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। খনিতে কাজ সারিয়া যখন সকলে বাড়ি ফিরিতেছিল তখন নাকি হঠাৎ পা পিছলাইয়া চইতা পাহাড় হইতে খাদের নীচে পড়িয়া যায়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে

একটি বৃহৎ পাথরের খণ্ড ধসিয়া পড়ে, এবং তাহারই আঘাতে চইতার নাকি হাত এবং পা ভাঙিয়া গিয়াছে!

সংবাদ পাইবামাত্র আমার বন্ধু অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রাত্রিতে যাওয়া তখন আর কোনও রকমে সম্ভব নয় বলিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে বেড়মোর দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গে আমিও চলিলাম।

আমরা যখন বেড়মোয় পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। চইতার ঘরের বাহিরে তাহার স্ত্রী বসিয়া চোখ মুছিতেছিল; আমাদিগকে দেখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে গ্রামের দুই চারিজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। বিছানার পাশে যাইয়া আমরা দেখিলাম যে চইতা স্থির হইয়া শুইয়া আছে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ উরু ফুলিয়া অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে। হাত বা অন্য কোন অঙ্গ ভাঙে নাই বটে, কিন্তু দক্ষিণ উরুর হাড় ভাঙিয়া একেবারে দুইখান হইয়া গিয়াছে। ফোলার জন্য পায়ের উপরের চামড়া টান হইয়া একেবারে তেলের মত চক্‌চক্ করিতেছিল এবং তাহার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া টের পাওয়া গেল যে চইতার সেখানে বিশেষ কিছু সাড়া নাই।

চইতার রোগশয্যা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। তাহার সংসার ক্ষুদ্র হইলেও একটি অসহায় ভ্রাতা এবং স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাহারই রোজগারের উপরে নির্ভর করিত। শুধু তাহাই নহে। বেচারা সুস্থদেহে প্রাতঃকালে কাজ করিতে গিয়াছে, কোথা হইতে দৈব দুর্ঘটনা আসিয়া যেন তাহার জীবনপথে হঠাৎ একটা বাধা সৃজন করিল।

আমার বন্ধুবর চইতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চইতা, তোমার কি কোনও কষ্ট হইতেছে?" চইতা ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "না বাবু, পা তো অনেক দিন খেটেছে, এবারে ছুটি চায়।" আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে তাহার কোনও ভয় নাই, হাসপাতালে

গেলেই পা সারিয়া যাইবে এবং সে বেশ কাজকর্ম করিতে পারিবে। কিন্তু চইতা হাসপাতালে যাইতে কিছুতে স্বীকার করিল না। সে ওঝার নিকটে জড়ীবুটীর চিকিৎসা করাইবে বলিয়া একটি টাকা চাহিল এবং বলিল, এখন হইতে না হয় সে "বইঠুয়া" হইয়া যাইবে, অর্থাৎ বসিয়া বসিয়া সকল কাজকর্ম করিবে। এমন ধীরভাবে সে কথাটি বলিল যে আমরা উভয়ে অবাক হইয়া রহিলাম। এরূপ দুরন্ত ব্যথার মধ্যে যে কেহ ধীরভাবে সারাজীবন পঙ্গু হইয়া থাকিবার কল্পনাও করিতে পারে তাহা কখনও ভাবিতে পারি নাই।

আমার বন্ধু চইতাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে হাসপাতালে তাহার পা কাটিয়া দিবে না, সে সত্য সত্যই আরাম হইয়া যাইবে; কিন্তু কিছুতেই চইতাকে টলান গেল না। ডাক্তারির উপরে তাহার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, এবং সে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। জড়ীবুটীর চিকিৎসা চলিতে লাগিল। চইতাও ক্রমে ক্রমে সারিতে লাগিল। মাস কয়েক পরে পায়ের জ্বালাযন্ত্রণা নিবারণ হইল বটে, কিন্তু চইতা পঙ্গু হইয়া পড়িল। সে বসিয়া বসিয়া ঘরের ভিতরে বা কুটীরের প্রাঙ্গণে চলাফেরা করিত। কিন্তু সেজন্য তাহার কোনও ক্ষোভ ছিল না। পা ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া সে কাহারও উপর রাগ করে নাই, যেমন অবস্থার মধ্যে আছে তাহাকে মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিত।

কয়েকমাস পরে আমরা আবার একবার বেড়মোয় গিয়াছিলাম। তখন চইতাকে ঘরে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাহার স্ত্রীর নিকট শুনিলাম যে সে আজকাল অল্পস্বল্প চলিতে ফিরিতে পারে এবং ছাগল চরাইবার জন্য আজ পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে গমন করিয়াছে। তাহার স্ত্রী এখন পাথরের খাদে কাজ করে, ছোট ভাইও ঝুড়ি বয়; এবং উভয়ের চেষ্টায় সংসারযাত্রা এক রকম করিয়া নির্বাহ হইয়া যায়।

ইহার পরে রাঁচি হইতে চলিয়া আসিলাম। কলিকাতার কর্মস্রোতের মধ্যে চইতার স্মৃতি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার কথা সম্পূর্ণরূপে কোনও দিন ভুলিতে পারি নাই। নিজের জীবনে কোনও দুঃখ ক্লেশের মধ্যে পড়িলে চইতার রোগশয্যার কথা মনে পড়িয়া যাইত। তাহার শান্ত মুখের হাসির কথা ও সহজ ভাবে সারা-জীবন "বইঠুয়া" হইয়া কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প মনে পড়িলে হৃদয়ে বল পাইতাম। নিজেদের জীবনের সামান্য মানসিক দুঃখকষ্টের ভারকে তখন নিতান্ত তুচ্ছ ও হালকা সামগ্রী বলিয়া বোধ হইত।

কিছুকাল পরে পূজার সময়ে আমি আবার রাঁচি গিয়াছিলাম। তখন এক দিন দল বাঁধিয়া বেড়মোতে বনভোজনের জন্য যাই। চুনের খাদে আসিয়া চইতাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। পুরাতন পথ চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। চইতার বাড়িতে পৌঁছিয়া তাহার ভাইটির সঙ্গে দেখা হইল। সে তখন একটু বড় হইয়াছে এবং তাহার গঠন একটু ঢ্যাঙা হইয়াছে। মুখে গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে। সে আমাদের জানাইল যে তাহার দাদা সকাল হইতে নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছে, এখনও বাড়ি ফেরে নাই।

ছোটনাগপুরে পাহাড়ী নদীর মধ্যে এক রকম মাছ পাওয়া যায়, তাহারা আকারে ছোট এবং পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া থাকে। ইহাদের গলার নীচে একটি চাকার মত অঙ্গ থাকে, সেইটিকে দৃঢ়ভাবে পাথরের গায়ে চাপিয়া ধরিয়া ইহারা পার্বত্য স্রোতের তাড়না সহ্য করিতে পারে। এই সকল মাছ সহজ উপায়ে ধরা কঠিন। কিন্তু পাহাড়ীরা ইহাদের ধরিবার জন্য একটি বিচিত্র উপায় বাহির করিয়াছে। জঙ্গলে মওনা নামক এক প্রকার বন্য গাছ জন্মায়। মওনার ফল মানুষের পক্ষে বিষ নয় বটে, কিন্তু মাছের উপর তাহার বিচিত্র ক্রিয়া

হয়। মাছ ধরিবার পূর্বে পাহাড়ীরা নদীতে একটি ক্ষুদ্র বাঁধ বাঁধিয়া দেয়। জল জমিয়া কতকটা স্থির হইলে মওনার ফল পাথরে ছেঁচিয়া বালির সঙ্গে বেশ করিয়া রগড়াইয়া সেই জলে মিশ্রিত করিয়া দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাছগুলির চোখ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহারা যন্ত্রণায় জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন তাহাদের গামছায় ছাঁকিয়া তুলিয়া লইলেই হইল।

আমরা বসিয়া থাকিতে থাকিতে চইতা এক ঝুড়ি মাছ লইয়া হাজির হইল। সারা বেলার পরিশ্রমে ইহাই তাহার লাভ হইয়াছিল। চইতার চলনে তখনও যথেষ্ট দোষ ছিল। কিন্তু সে কথা যে তাহার মনে পড়ে ইহা একেবারে মনে হইল না। তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষা শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে শেষ পর্যন্ত চইতাই হয়ত জয়ী হইয়াছে। তাহার শরীরের অত বড় দুর্ঘটনা মনের উপর বিন্দুমাত্র চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। পূর্বের মত সে রোজগার করিতে পারে না, তাহাতে কি হইয়াছে? পা ভাঙিয়া সে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই বা কি?

আসিবার সময়ে চইতা একটি ছোট ঝুড়িতে করিয়া কিছু মাছ আমাদের সঙ্গে গাড়িতে চাপাইয়া দিল। আমরা কিছুতেই লইব না, সেও ছাড়িবে না। অবশেষে তাহার স্নেহের উপহার আমরা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। মাছ লইয়া আমরা বনভোজনের জায়গায় ফিরিয়া আসিলাম।

সেই আমার চইতার সঙ্গে শেষ দেখা। সেও আট বৎসরের উপরের কথা। কিন্তু তাহার সরল সাহস ও শেষ দিনের মধুর ব্যবহারের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই।

সন্ন্যাসী

হিমালয় প্রদেশে যেখানে জ্বালামুখী তীর্থ আছে তাহার উত্তরভাগে এক সময়ে ত্রিগর্তমণ্ডল নামে এক রাজ্য ছিল। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা বলিয়া এই প্রদেশটি বহু দিন ধরিয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্থানটি প্রাচীন এবং এখনও এখানে বহু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের বাস। ত্রিগর্তমণ্ডলের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোনও কোনটি জীর্ণ ও ভগ্নদেহে প্রাচীনকালের স্মৃতি বহন করিয়া আছে, কোনটি বা গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীদিগের উৎসাহে অভগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! সেগুলিতে এখনও সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্বে ঘুরিতে ঘুরিতে পাঠানকোটের পূর্বদিকে এমনই একটি পুরাতন গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামটির নাম পাঠিয়ার। সেখানে যে সময়ে পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে; অথচ সকালে যখন যাত্রা করি তখন একরূপ স্থির ছিল যে সন্ধ্যার পূর্বেই পাঠিয়ার হইতে প্রায় ক্রোশখানেক দূরের একটি মন্দির দেখিয়া আসিব।

গ্রামের মধ্যে সরকারী সড়কের নিকট একটি হালুয়াইএর দোকান ছিল, লোকটির যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল। গলায় কয়েক ছড়া মালা, কপালে তিলক এবং মস্তকে একটি দীর্ঘ পাগড়ি ছিল। হিমালয় প্রদেশে খাবারের দোকানে অতিথি-সজ্জনের জন্য শুইবারও বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। কিছু খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত চারি পয়সা ভাড়া দিলে এক

রাত্রের জন্য একটি খাটিয়া ভাড়া পাওয়া যায়। তিব্বত, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যে সকল পথিক অথবা ব্যবসায়ী যাতায়াত করে, এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের খুবই সুবিধা হয়। উপরন্তু দোকানীগণেরও ইহা দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

আমার জিনিসপত্র দোকানের একপ্রান্তে গুছাইয়া রাখিয়া আমি দ্রুত-পদে প্রাচীন দেবালয় সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম ইতিহাসপাঠে ইহাকে যত প্রাচীন বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, বস্তুতঃ উহা তত প্রাচীন নহে। তথাপি মন্দিরটির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আহরণ করিয়া যখন পাঠিয়ারে ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি ফিরিয়া আসিবার পর হালুয়াই আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। আমিও তাহার নির্দেশমত হাতমুখ ধুইবার জন্য নিকটস্থ নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

সে সময়ে রজনী শুক্লপক্ষ ছিল। সরকারী রাস্তার অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ছিল। ত্রিগর্তমণ্ডল স্বভাবত পর্বতাকীর্ণ হইলেও পাঠিয়ারের নিকটস্থ প্রদেশের কতকাংশ সমতল। নদীটি চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করিয়া কিছুদূরে একটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। পার্শ্বস্থ মাঠের মধ্যে এবং নদীপ্রান্তে দুই একখণ্ড বড় পাথর দেখা যাইতে-ছিল। সন্ধ্যার নির্জনতা উপভোগ করিবার জন্য তাহার উপর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল। দূর হইতে লোকালয়ের কোলাহল শোনা যাইতেছিল। গৃহস্থেরা তখন অধিকাংশই বাড়ির উঠানে খাটিয়ায় আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। কেহ বা হয়ত দল বাঁধিয়া গান গাহিতেছে। আকাশে চাঁদের আলো খুব হালকা কুয়াশায় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল।

অনেকক্ষণ নদীতটে বসিয়া থাকিবার পর দোকানে যখন ফিরিলাম,

দোকানী অতিশয় যত্নসহকারে খাবার সাজাইয়া দিল, এবং আহারান্তে গল্প করিবার জন্য উপবেশন করিতে বলিল। আমি তাহাকে আহার্যের মূল্যের সঙ্গে রাত্রে শয়নের জন্য যখন আরও মূল্য ধরিয়া দিতে গেলাম তখন সে কিছুতেই তাহা লইতে রাজী হইল না। বিদেশী যাত্রী তাহার দেশের মন্দির দেখিতে আসিয়াছে, তাহার নিকটে আহার্যের মূল্য লইয়াই যেন সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি করিবে, তাহাকেও তো রোজগার করিয়া দিনপাত করিতে হয়!

দোকানে কাজকর্ম সারিবার পর দোকানী তাকের উপর হইতে একখানি পুরাতন গ্রন্থ নামাইয়া প্রদীপের সম্মুখে পাঠ করিতে বসিল। তাহার ছোট্ট নাতিটি সারাদিন দাদামহাশয়ের হাতে এটা-ওটা জোগাইয়াছে। সেও ক্লান্তদেহে দেওয়ালের ধারে ক্ষুদ্র চটের বিছানায় বসিয়া দাদামহাশয়ের সুর করিয়া গ্রন্থপাঠ শুনিতে লাগিল।

প্রাচীন যুগের কথা। ত্রিগর্তমণ্ডলের কোন্ রাজা কবে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ধর্ম এবং গোব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহারই গল্প ব্রাহ্মণ সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে ভাবের আবেগে ক্ষুদ্র নাতিটিকে এই সকল বীরত্বের কাহিনী আরও সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। আমি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বালকটি ঘুমাইয়া পড়িল। তখন তাহার বৃদ্ধ দাদামহাশয় আস্তে আস্তে উঠিয়া নাতির গায়ে বেশ করিয়া কাঁথাটি জড়াইয়া দিল, এবং মাথার নীচে গামছা পাট করিয়া বালিশের মত স্থাপন করিল। তাহার পর নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া একটু চাপা গলায় পুনরায় ইতিহাসের কাহিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলে আমি দোকানীকে শুইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। বৃদ্ধ যত্নসহকারে আমাকে দোকানের উপরে কাঠের

দোতলা ঘরে লইয়া গেল। এবং সেখানে নিজের বিছানাটি দেখাইয়া তাহাতেই আমাকে শুইতে অনুরোধ করিল। এবং বলিল, আমি যেন আজ তাহার এই সামান্য অতিথিসেবা প্রত্যাখ্যান না করি।

দোকানীর অনুরোধ সহজেই আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহার আয়োজন হয়ত সামান্য, কিন্তু দূরদেশে একজন মানুষ অপরিচিত এক ব্যক্তির জন্য এরূপ অযাচিত স্নেহ বিতরণ করিতেছে ভাবিয়া সত্যই আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না, গভীর রাত্রে নীচে কয়েক ব্যক্তির উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। দোকানীর গলার আওয়াজ চিনিতে পারিলাম, এবং তাহার সঙ্গে আরও দুই তিনজন, পাহাড়িয়া ভাষায় কথা বলিতেছে বুঝিতে পারিলাম! কাহারও অসুখের কথা হইতেছিল। হাসপাতাল ও ডাক্তারের কথা, কিছু গরম দুধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা—ওই সকল কথা মাঝে মাঝে বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু সেই রাত্রে উঠিয়া কি হইয়াছে তাহা আর অনুসন্ধান করিবার মত উৎসাহ ছিল না। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। পুনরায় যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে, পূর্বদিকে আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গুছাইয়া প্রাতভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহিরে বেশ সুন্দর হাওয়া বহিতেছিল। কিছুদূর যাইতেই রাত্রের সেই নদীটির নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভোরের আলোয় কিন্তু দেখিলাম, তাহার রাত্রের সৌন্দর্য যেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। চারিদিকে ধূসর মাটি, মাঝে মাঝে কালো পাথর জাগিয়া আছে, এবং তাহারই পাশ দিয়া ক্ষীণকায়া নদীটি সামান্য খালের মত বহিয়া চলিয়াছে। রাত্রের সেই অপরূপ শোভা যেন তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

ভোর কাটিয়া গিরা তখন বেশ সকাল হইয়া আসিয়াছে এবং মাঠের পথে দুই চারিজন লোকও চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় সাদা টুপি পরিয়া নদীর পথ দিয়া যাইতেছিল। আমিও বেড়াইতে বেড়াইতে খানিকদূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময় জলের ধারে একটি চেটাল পাথরের উপর হঠাৎ মনে হইল কি একটি বস্তু পড়িয়া আছে। কৌতূহলের বসে নিকটে যাইতেই গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। দেখিলাম পাথরের উপরে একজন জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

তিনি মৃত্যুর পূর্বে হয়ত বসিয়া ছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য হয়ত তাঁহার ছিল না, সেইজন্য পা মুড়িয়া পাশে একখণ্ড পাথরের গায়ে হয়ত হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়; পাশে অগ্নির একটি কুণ্ড ছিল। তাহার শিখা বহুক্ষণ নিভিয়া গিয়াছিল। প্রভাতসমীরণে ছাইগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সাধুর দেহও ক্রমশঃ মৃত্যুর স্পর্শে কঠিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর উহা আর পাথরের উপর স্থির থাকিতে পারে নাই, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অবশেষে উল্টাইয়া পড়িয়াছে। পা মোড়া ছিল বলিয়া শরীরের অধোভাগ কাঠের পুতুলের মত আকাশের দিকে উঠিয়া রহিয়াছে, মাথা ধূলির উপর লুটাইতেছে এবং জটার একপ্রান্ত জলস্রোতে ভিজিয়া গিয়াছে। গায়ে একখানি চাদর ছিল। তাহা জড়াইয়া একটি হাত ও পিঠের কিয়দংশ ঢাকিয়া রহিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া বস্তুটিকে একটি অস্বাভাবিক ও বীভৎস রূপ দান করিয়াছিল।

আমি দাঁড়াইয়া কি করা উচিত তাহা ভাবিতেছি, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ মুসলমান নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেচারা, সন্ন্যাসী সত্যই মারা গিয়াছে, ইহা যেন প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না। সে

আমাকে বলিল যে এই সাধু কয়েক দিবস হইল গ্রামের প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খুবই রুগ্ন ছিলেন, এখন হয়ত রোগের তাড়নায় উপস্থিত জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধ মুসলমান দুই চারিবার পরম স্নেহে সন্ন্যাসীকে, "ভইয়া উঠো, উঠ যাও ভইয়া" বলিয়া ডাক দিল। কিন্তু তখন কে তাহার সেই স্নেহের আহ্বানে সাড়া দিবে?

আরও বেলা হইতে গ্রামের লোকজন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার মধ্যে আমার বন্ধু ও আশ্রয়দাতা হালুইকরকেও দেখিতে পাইলাম। সে তখন সন্ন্যাসীর ইতিবৃত্ত বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যান করিল।

প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে সন্ন্যাসী পাঠিয়ার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেকদিন রোগে ভুগিয়া তাঁহার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের লোকজন তাঁহার সেবাযত্নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিল বটে, কিন্তু তিনি সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি গৃহস্থ-গণকে বলিলেন যে তাঁহার শরীর অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সে শরীরের দ্বারা আর কাজ চলিবে না, সেইজন্য তিনি ইহা ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। গৃহস্থেরা দুধ, আটা প্রভৃতি যাবতীয় আহার্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার কিছুই স্পর্শ করেন নাই। ফলতঃ কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

গতরাত্রে শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল। দোকানী এবং অপর কয়েকজন তাঁহাকে গরম দুধ খাওয়াইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, গ্রামের জনৈক বৈদ্য তাঁহাকে বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী হাসিমুখে সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেন। দোকানীরা যখন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে চলিয়া আসে তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রম করিয়াছে। তাহার পরেই হয়ত তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃতদেহ পড়িয়া যাওয়ার ফলে আঘাত লাগিয়া মুখের এক অংশ বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মুখে কোনরূপ ব্যথা বা যন্ত্রণার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। চোখে নিতান্ত একটা অর্থহীন চাহনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

গ্রামের লোকজন ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর সমাধির যাবতীয় আয়োজন করিতে লাগিল। আমিও পাঠিয়ার হইতে অন্য গ্রামের অভিমুখে রওনা হইলাম। কিন্তু সন্ন্যাসীর কথাটা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না। শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দ্বারা আর কাজ চলিবে না, অতএব তাহাকে পরিহার করিতে হইবে, এই কথা অনাড়ম্বর ভাবে যে লোক ভাবিতে পারে, তাহার কত শক্তি !

আর সেই মৃত্যুর অর্থহীন চাহনি আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। সেদিন যেমন সন্ন্যাসীর মৃত্যুর কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই, আজও তেমনই সময়ে সময়ে মনে হয়, আমাদের এই জীবনেরই বা অর্থ কি ? তাহারই বা সার্থকতা কোথায় ?

কবি

পুরী জেলায় কণারকের মন্দির হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে রেঞ্চ নামে একটি গ্রাম আছে। প্রায় বার বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি, তখন সেখানে বীরকিশোর মহান্তি নামে জনৈক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি তখনই বেশ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন কিনা জানি না। যাহাই হউক, একদিন অপরাহ্ন কালে আমরা সেই গ্রামের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। কয়েক দিবস পূর্বে পার্শ্ববর্তী কোনও গ্রামে আমরা মহান্তি মহাশয়ের কথা প্রথম শুনিতে পাই। অতিশয় ভগবদ্ভক্ত ও পরোপকারী সজ্জন বলিয়া তাঁহাকে সকলে শ্রদ্ধা করিত। তদ্ভিন্ন উড়িষ্যা ভাষায় উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। গ্রামের পাঠশালাটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন শুনিলাম। এই সকল নানা কারণে একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য মনে বড় বাসনা ছিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল বলিয়া আমরা সদর রাস্তা হইতে কিছু দূরে গ্রাম্য পথ ধরিয়া রেঞ্চ গ্রামের অভিমুখে রওনা হইলাম। গ্রাম্য পাঠশালাটির কাছে আসিতেই দুই তিন জন ভদ্রলোক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন দীর্ঘকায় গৌরকান্তি পুরুষ ছিলেন। তাহার অনেক বয়স হইয়াছিল, মাথার চুল সবই পাকিয়া গিয়াছিল এবং গলায় বেশ বড় তুলসীর মালা ছিল। পরিচয়ে জানিলাম ইনিই বীরকিশোর মহান্তি মহাশয়।

আলাপ-আপ্যায়নের পর আমরা তাঁহার সঙ্গে পাঠশালাটি পরিদর্শন

করিতে গেলাম। পাঠশালায় শুনিলাম উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। উহাতে প্রবেশ করিয়া এমন দুইটি জিনিস আমাদের চোখে পড়িল, যাহা পুরী জেলায় অন্য কোনও পাঠশালায় দেখি নাই। পাঠশালায় একজন হিন্দু বিধবা রমণী অন্যান্য শিক্ষকগণের সহিত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পড়াইতেছিলেন এবং ছাত্রীদের মধ্যে এমন বয়সের দুই তিনটি বালিকা ছিল যাহাদের সমবয়স্ক ছাত্রী অপর কোনও পাঠশালায় দেখি নাই। বীরকিশোর মহান্তি মহাশয় পরিচয় দিলেন যে শিক্ষয়িত্রীটি তাঁহার বিধবা কন্যা এবং বলিলেন ঐ কন্যার জন্যই তিনি পাঠশালাটি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

অনেক বৎসর পূর্বে, অতি অল্প বয়সে তাঁহার কন্যার বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্পকাল পরেই, কোনও সন্তানাদি হইবার পূর্বে তিনি বিধবা হন। তাঁহাদের জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় মহান্তি মহাশয় কন্যার জন্য অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন একদিন তাঁহার মনে হয় যে কন্যাকে যদি শিক্ষয়িত্রীর কার্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে হয়তো শিশুদের লইয়া তিনি জীবনের অনেক যন্ত্রণা ভুলিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু উড়িষ্যার গ্রাম্য সমাজ বাংলার সমাজ অপেক্ষা আরও বেশী রক্ষণশীল। এমন সমাজের ভিতর হইতে কন্যাকে শহরে শিক্ষয়িত্রীর কার্যশিক্ষার জন্য পাঠাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সাহস খুব কম লোকেরই হইবার কথা। বীরকিশোর মহান্তি মহাশয় সাহসে নির্ভর করিয়া কন্যাকে কটক ট্রেনিং স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। তিনি জাতিচ্যুত হইলেন। কিন্তু কোনওরূপে ধৈর্য না হারাইয়া তিনি কন্যার শিক্ষা-সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শিক্ষা শেষ হইলে মহান্তি মহাশয় গ্রামে বালকবালিকাদের জন্য

একটি পাঠশালা স্থাপন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও ভদ্র ঘরের ছাত্র বা ছাত্রী পাঠশালায় আসিল না। তখন মহান্তি মহাশয় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতে ছাত্র এবং ছাত্রী ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুদিন চলিল। ক্রমশঃ গ্রামের লোক অনুভব করিল যে পাঠশালার সংস্পর্শে আসিয়া ছাত্রদের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। তখন তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিয়া মহান্তি মহাশয়ের সঙ্গে অল্প অল্প মিশিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা গ্রাম্যমণ্ডলীর সভা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জাতিতে গ্রহণ করিল এবং তাহারই চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটি তুলসীর মালা উপহার দিল। মহান্তি মহাশয় মালাটি বার বার দেখাইয়া বলিলেন, ইহা তাঁহার জীবনের মত প্রিয়, কেননা জাতির মণ্ডলী নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়াছিল।

কিন্তু এই জাতিচ্যুতি হইতে পুনরায় জাতিতে গ্রহণের মধ্যে দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি এতদিন স্থিরভাবে গ্রামে বাস করিলেন কেমন করিয়া? মহান্তি মহাশয় উত্তর দিলেন, "গ্রামের লোকে যে ভুল করিতেছে, এই বোধই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। যাহারা ভুল করিতেছে, তাহাদের উপর রাগ করিব কেমন করিয়া? একদিন না একদিন তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবে। আমি কেবল সেই দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলাম।" মানুষের অন্তরের প্রতি এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া সত্যই বড় বিস্ময় লাগিল, এবং যিনি এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ লোকের বিরাগ সহ্য করিয়াছেন অথচ নিজের চরিত্রের মাধুর্য হারান নাই, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা হইতে মস্তক নত হইয়া গেল।

কথায়-বার্তায় আমরা পাঠশালার পার্শ্বে একটি উদ্যানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রথমে লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু তখন দেখিলাম যে বাগানটি কেবল বেল, যুঁই, মল্লিকা, তুলসী প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে সজ্জিত রহিয়াছে। কয়েক বিঘা জমি জুড়িয়া কেবল ফুলের গাছ, অন্য কোনও গাছ সেখানে নাই। মহান্তি মহাশয়কে একথা বলায় তিনি বলিলেন, "ফলের চাষ তো সকলেই করে। দু-চারজন অন্ততঃ যদি ফুলের চাষ না করে, তবে যে সমস্ত পৃথিবী নীরস, নিরানন্দ হইয়া যাইবে।" বাস্তবিক কথাটি চমৎকার। কিন্তু আরও চমৎকার লাগিল এই শুনিয়া যে সমস্ত বাগান তিনি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ে স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছেন, আর কাহারও পরিশ্রম ইহাতে নাই। মনে ভাবিলাম, সত্যই ইনি সুন্দরের উপাসক, কবি। যিনি পরের মজুরির উপর নিজের আলস্যের আসন রচনা করিয়া শুধু মনোহর বস্তু সৃষ্টির বিলাস করেন না, বরং নিজের পরিশ্রমের দ্বারা, জীবনের বহুবিধ দুঃখ-নির্যাতনের মধ্যে সুন্দরকে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিই সত্য কবি, তাঁহারই সুন্দরকে পূজা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে; হয়তো আমাদের সে অধিকার হয় নাই।

সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আমরা মহান্তি মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্যের অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে কেবলই মনে হইতে লাগিল যে আজ সত্যই একজন কবির সাক্ষাৎ পাইয়াছি, যাঁহার সহিত চারিদিকের জীবনের কোনও বিরোধ নাই, এবং যাঁহার চরিত্রের সৌরভে চতুর্দিক সত্যই মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

সাধু

চায়ের দোকানে চা খাইতেছি, এমন সময়ে একজন পৌঢ় গেরুয়াধারী সাধু দোকানে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া এক কাপ চায়ের ফরমাশ দিলেন। চা লইয়া একটি কৌটা হইতে প্রায় আধ ভরি আফিম বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। দেখিয়া বড় ভক্তি হইল। হাত জোড় করিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলাম। সাধু-বাবা চোখ মুদিয়া ছিলেন, বোধ হয় দেখিতে পান নাই। আফিমের নেশাটি ঘোর হইয়া আসিলে নিজেই আলাপ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "ভায়া যা ভাবছ তা নয়। আগে এক ভরি করে খেতাম। গান্ধী মহাত্মা বারণ করেছেন, তাইতো ছ' আনায় দাঁড় করিয়েছি।"

সাধু-বাবার সঙ্গে আলাপ জমিয়া গেল। ক্রমে জানিলাম তাঁহার নাম ভবানন্দ গিরি। উপযুক্ত লোক। ভারতবর্ষের বহুস্থান ঘুরিয়া গায়ের রঙ ঘোর তামাটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে একটি ঝুলিতে দু-এক প্রস্থ কাপড়, মাথায় পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং হাতে একটা মোটা লাঠি। সেটি বড় প্রিয়। সহজে ছাড়েন না। ব্যবসায়, চিকিৎসা। চায়ের আড্ডায়, রাস্তায়, মন্দিরে যেখানেই একটি শিকার দেখিতে পান সেখানেই তাহাকে বলেন, "তোমার অসুখ হইয়াছে।" সংসারের অধিকাংশ লোকই মনে করে তাহার শরীরে একটা না একটা ব্যাধি আছে, সাধুর মুখে সেই কথা শুনিয়া তাহাদের সহজেই প্রত্যয় হয়। তাহার পর পেস্তা, বাদাম, কিসমিস সহযোগে

একটি উপাদেয় ঔষধ তৈয়ারি করিয়া সাধু তাহাদিগকে খাইতে দেন। রোগীর শরীরের যে উপকার হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; সঙ্গে সঙ্গে ভবানন্দের ঝুলিতেও কিছু আমদানি হয়।

লোকটির স্বভাব কিন্তু ভাল। সন্ধ্যা হইলেই সারাদিনের রোজগার খরচ করিয়া ফেলিত। গুরুর আদেশে রাত্রে হাতে নাকি পয়সা রাখা নিষেধ। চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা কোনও দিন চার আনা, কোনও দিন বা দুই টাকাও রোজগার হইত। তাহার সবটাই দান-ধ্যানে এবং আফিমের পিছনে রাত্রের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইত। আবার সকাল হইতে সাধুকে রোজগারের ভাবনা ভাবিতে হইত। বহুদিন অদ্যভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ অবস্থায় কাটাইয়া সংসারের লোকের উপর সাধুর কেমন একটা বাঁকা নজর হইয়া গিয়াছিল। সহজে তাহারা পয়সাকড়ি দিবে না, রোগতাপের অছিলায় কিছু কামাইয়া লইতে হইবে, এইরূপ একটা ধারণা সাধুর অন্তঃকরণে বহুবিধ দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ভবানন্দের সঙ্গে আলাপ হইবার দু-চার দিনের মধ্যেই সে একদিন চুপি চুপি আমাদের বলিল, "ভায়া, তোমাদের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছে। তোমরা ভাই আর কিছু বোলো না। অনেক ঘুরে এলাম, কিছুদিন স্বস্তিতে থাকতে দাও।"

ভবানন্দ বেশ গল্প করিতে পারিত। বিশেষ করিয়া আফিমের নেশা যখন জমিয়া আসিত। একদিন মানস সরোবরের গল্প হইল। ভবানন্দ বলিল, "সে কি বলব ভাই। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। বহু কষ্টে তো মানস সরোবরে পৌঁছান গেল। যা' ঠাণ্ডা! পায়ের আঙুল শীতে ফাটবার যোগাড় হয়েছে। কিন্তু কি করি, তীর্থস্নান তো করতেই হবে। মানসের জলে নেবে যাই ডুব দিয়েছি, অমনি কানের ভিতর যেন একটা ভোঁ-করে আওয়াজ লেগে গেল। মাথাটা ঘুরে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ

হয়ে মাথা তুলে দেখি—জয় গুরু—কোথায় মানস সরোবরে স্নান করছিলাম, না একেবারে কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত।”

আমরাও বুঝিলাম গল্পের দফা আজ মাটি, আফিম বোধ হয় ছয় আনার জায়গায় দশ আনায় উঠিয়াছে। যাই হোক, এমনি করিয়া ভবানন্দ রোজ রোজ একটা গল্প বলিত। কবে কাবুলের বাদশা তাহাদের পনের জন সাধুকে রাজভোগ খাওয়াইয়াছিলেন, কেমন করিয়া অমরনাথে দুই শ্বেত পারাবত আকাশের দিক হইতে নিমেষের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া পাথর হইয়া গেল, আবার গলিয়া জল হইল—এমনি সব প্রাকৃত, অপ্রাকৃত অনেক কিছু।

এমনি ভাবেই দিন যায়। একদিন শহরে এক নামজাদা সাধু আসিলেন। বিশ্বের গুরু না হইলেও তাঁহার চেলা-চামুণ্ডার সংখ্যা কম ছিল না। চামুণ্ডার চেয়ে চামুণ্ডীর সংখ্যাই বেশী। যাই হোক, আমরা ঠিক করিলাম সাধুসঙ্গ করা ভাল। কিন্তু একা যাইতে ভরসা হইল না, কি জানি যদি একটা হাতাহাতি ব্যাপার হইয়া যায়। সঙ্গে একজন রাশভারি লোক থাকা প্রয়োজন। কাহাকেই বা লই! ভবানন্দকে বলিতেই সে রাজী হইয়া গেল।

মাথায় এক বিরাট পাগড়ি বাঁধিয়া, সন্ধ্যায় ভবানন্দের আফিমের নেশাটি যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন আমরা দলবদ্ধ হইয়া রওনা হইলাম। সাধুর দর্শন লাভ হইল বটে, কিন্তু তিনি হয়তো আমাদের কথাবার্তায় কিছু ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা যতক্ষণ গুরুদেবের সহিত কথা বলিতেছিলাম, ততক্ষণ ভবানন্দ চক্ষু মুদিয়া স্থিরভাবে আসন করিয়া বসিয়া ছিল। গুরুদেব চলিয়া গেলে তাঁহার শিষ্যেরা আমাদের সহিত সাধনভজনের গল্প আরম্ভ করিলেন। আমাদের চেয়ে ভবানন্দের উপরেই তাঁহাদের সবিশেষ

অনুরাগ দেখিলাম। কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু, কতদিন এই মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, এই সকল কথাবার্তার পর তাঁহারা ভবানন্দকে স্বীয় সাধনার ইতিহাস বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ভবানন্দ বরাবর চোখ মুদিয়া কাষ্ঠমূর্তির মত বসিয়া ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "উট চরাতাম্।" আমরাও কথাটার অর্থ প্রথমে ধরিতে পারি নাই। একটু ব্যাখ্যা করিতে বলায় ভবানন্দ বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিল। বলিল, কানপুরের নিকটে কোনও অঘোরীর আশ্রমে সে প্রথমে শিষ্য হয়। তাহার পর সাধনভজনের একটা পথ চাহিলে গুরু তাহাকে আশ্রমের উট চরাইতে বলিলেন। তখন ভবানন্দ সাত বছর ধরিয়া কেবল উটই চরাইল।

সভাস্থ সকলেই গুঞ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "অহো, কি গুরুভক্তি। এরূপ ধৈর্য না থাকিলে কি সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়?" যাহাই হউক, উটই চরান, আর ঘাসই কাটুন, আমরা আর কিছু আলাপ-আপ্যায়নের পর ভবানন্দকে লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। পথে তাহাকে বলিলাম, "দাদা, করেছিলে কি? নেশার মাথায় আর কিছুক্ষণ জমালেই ওরা সব ধরে ফেলতো।" ভবানন্দ বলিল, "ভায়া হে, ওরকম লোক ঢের দেখেছি। ওরাও মানুষ চরিয়ে খায়, আমি না হয় উট চরিয়েই খাই। তাতে ওদেরই বা কি, আমারই বা কি?"

এমনি ভাবে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। ক্রমে শীতের পর গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়িল। ভবানন্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হইত। কখনও কোনও মৃগী-রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইতেছে, কখনও বা বাতব্যাধির। যাই হোক চৈত্রের শেষ নাগাদ যে বৎসর বদরিকাশ্রম যাইব স্থির করিলাম, ভবানন্দ শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "ভাই, আর ভাল লাগে না। ঘেন্না ধরে গেছে। যত আহাম্মককে চরিয়ে খাওয়া আর

পারা যায় না। চল এবার একবার মহাদেবের শ্রীচরণ দর্শন করে আসি। জয় গুরু।"

যাঁহা বলা তাঁহা কাজ। সঙ্গে লটবহর তো কিছুই নাই। সাধু আমাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর বদরিকাশ্রমে পৌঁছি- সেখান হইতে গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী সব সারিয়া কেমন একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গের সাথীরা একে একে সবাই সঙ্গ ছাড়িলেন; কেহ বা দুইমাস কেহ বা তিনমাসেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রহিল কেবল ভবানন্দ সন্ন্যাসী।

আমিও তখন কাপড়-চোপড় ময়লা হইবার ভয়ে গেরুয়া ধরিয়াছি। অল্প কাপড়েই চলিয়া যাইত; তাহার উপর আর একটা লাভও ছিল। যত্রতত্র ভোজনও জুটিয়া যাইত। শুইবার স্থানের তো বালাই নাই। আজ এ আখড়া, কাল ও গ্রাম! কোনদিন পাহাড়ে যাহারা ভেড়া চরায় তাহাদের সঙ্গে, কোনদিন বা নদীর ধারে কোনও হনুমানজীর মন্দিরে রাত কাটিয়া যাইত।

এমনি করিয়া এক বছরের উপর ঘুরিয়া গেল। কাটিতেছিলও ভাল। পথে আমরা জন ছয়েক নাগা সন্ন্যাসী সঙ্গ পাইলাম। তাঁহারাও তীর্থে তীর্থে ঘোরেন, আমরা দুই বাঙালী প্রাণীও তাই। এদিকে বর্ষা নামিয়া আসিল, পথ চলাও ক্রমশঃ দুষ্কর হইয়া উঠিল। সেবার বর্ষার প্রায় গোড়ার দিকেই আমরা জ্বালামুখী তীর্থের দিকে যাইতেছি, এমন সময়ে এক বিপদ ঘটিল। চারিদিকে অবিশ্রান্ত জলধারায় পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উপর পাথরের গা সবুজ শৈবালরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এমনি একটা পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন আমি পা পিছলাইয়া প্রায় পনের হাত নীচে খাদে পড়িয়া গেলাম।

প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারি নাই। সমস্ত বোধশক্তি কেমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাহাড়ের নীচে রহিয়াছি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। উপর হইতে লোকেরা আমাকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, ক্রমে পাগড়ি বাঁধিয়া নামিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। সবই দেখিতেছিলাম, বুঝিতেছিলাম। কিন্তু ঘটনাটা যে আমাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতেছে, ইহা ঠিক প্রত্যয় হইতেছিল না।

তাহার পর আর বহুদিনের কথা ভাল করিয়া মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম নুরপুরের হাসপাতালে শুইয়া আছি এবং পাশে সেই কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসী ও সাধু ভবানন্দ গিরি। ভবানন্দের নিকট সব কথা শুনিলাম। কেমন করিয়া পাহাড়িয়া ওষুধ পত্র দিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দীর্ঘ পনের দিন ধরিয়া সকলে আমাকে হাতে হাতে লইয়া আসিয়াছে, কেমন করিয়া দারুণ শীতের মধ্যে নাগারা নিজেদের সমস্ত কম্বল দিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছে, নিজেরা সেঁকো-বিষ খাইয়া ঠাণ্ডা কাটাইয়াছে, এই সব কথা। এমনি করিয়া অবশেষে তাহারা আমাকে হাসপাতালে আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছে। হাসপাতালের অধ্যক্ষদের সঙ্গে নাকি ভবানন্দ কোম্পানীর ইতিমধ্যে তুমুল কলহ হইয়া গিয়াছে। নাগারা যখন তখন আসিত বলিয়া তাঁহারা আপত্তি করেন। তাহাতে নাগারা ডাক্তারদের চিমটা লইয়া তাড়া করিয়াছিল। ফলে ব্যবস্থা হয় যে রোগীকে বারান্দায় রাখা হইবে এবং নাগারা যখন তখন আসিতে পারিবে।

এমনি করিয়া দীর্ঘ তিন মাস হাসপাতালে কাটাইলাম। নাগারাও রোজ আসিত, ভবানন্দ তো ছিলই। তাহার গল্পের কামাই ছিল না। হিমালয়ের সম্বন্ধে প্রাকৃত, অপ্রাকৃত কত গল্পই যে শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে আরোগ্যলাভের পর হাসপাতাল হইতে ছুটি

পাইলাম। ভবানন্দ ও নাগারা তখন কোথা হইতে পয়সা সংগ্রহ করিয়া আমাকে কলিকাতার একখানি টিকিট কিনিয়া দিল ও সঙ্গে নগদ পাঁচটি টাকা দিল। সেই নাগাদের সঙ্গে শেষ দেখা। পথের মধ্যে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু কোনদিন তাহারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীয় করিয়া লয় নাই। অবশেষে বিপদের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম ইহারা না জানাইয়াও আমাকে কিরূপ পরমাত্মীয় করিয়া লইয়াছে। বন্ধুর মত তাহাদের পাইয়াছিলাম বটে, গ্রীষ্মের পরে স্নিগ্ধ বারিধারার মতই তাহারা আমাকে শীতল করিয়া দিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ষাশেষের মেঘেরই মত তাহারা আবার নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ভবানন্দও তাই। তাহার সহিত আর একরকম দেখা হয় নাই বলিলেই চলে, হয়তো সেও সংসারের বহু লোকের মত আমাকে এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছে।

একেবারে যে দেখা হয় নাই তাহা নয়। কয়েক বৎসর পরে বোলপুরে একবার রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন দেখিতে গিয়াছি। বৈশাখের মাঝামাঝি। বোলপুর শহরের ভিতর একটি গঞ্জিকার দোকানে ভবানন্দের মত এক ব্যক্তি কি কিনিতেছে দেখিলাম। প্রথমটা ঠিক চিনিতে পারি নাই। আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিতেছি, যেন আরও কিছু বৃদ্ধ হইয়াছে, লাঠিটা কিন্তু বদল হইয়া গিয়াছে। আমি তাকাইয়া আছি দেখিয়া বলিল, "হাঁ ভবানন্দই বটে, ভায়া কোথা থেকে?" সাইকল হইতে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে রাত্রে শান্তিনিকেতনের পথে এক নাগা সন্ন্যাসীর মন্দিরে আড্ডা গাড়িয়াছে। সন্ধ্যায় যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া বাজারে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার পূর্বেই কিন্তু ভীষণ দুর্যোগ আরম্ভ হইল। দারুণ ঝড়ের

মধ্যে ঘন ঘম বজ্রপাত ও ভীষণ শিল পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঠ সাদা হইয়া গেল। তেমন শিলপড়া কখনও দেখি নাই। সে সন্ধ্যায় ভবানন্দের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। তার পরদিন সন্ধান লইয়া জানিলাম সাধু রাত্রেই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় কেহ তাহা বলিতে পারিল না।

তাহার পরেও একবার হাবড়ায় যাইতে যাইতে হঠাৎ পুলের উপর মনে হইল ভবানন্দ যাইতেছে; কিন্তু ঠিক কিনা বলিতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সাধু যেমন আমার হৃদয়ের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তাহার প্রাণেও কি আমার কোনও স্থান নাই? হয়তো নাই। তাহার মনের উপর কোনও স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে পারিব এমন সুকৃতি আমি করি নাই। বহুদিনব্যাপী দারিদ্র্যদুঃখের ভিতর দিয়া সংসার তাহার মনে ভালবাসার সব রসটুকু নিঃশেষে শুকাইয়া দিয়াছিল। সেখানে কাহারও স্মৃতি দীর্ঘদিন বাসা বাঁধিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ পরের বেগার খাটিতে ভবানন্দের কখনও কামাই ছিল না। উপকার সে সকলের করিত বটে, কিন্তু রেলের মালগাড়ি যেমন করিয়া মাল বহিয়া লইয়া যায় তেমনি করিয়াই করিত। পরের তাহাতে যতই লাভ হউক না কেন, ভবানন্দের নিজের তাহাতে কোনও আনন্দও ছিল না, কিছু আপত্তিও ছিল না।

শিল্পী

পুরীতে সামান্য একটি পল্লীর মধ্যে কয়েকঘর পাথুরিয়া বাস করে। ইহারা এখন জগন্নাথদেবের ছোট ছোট মূর্তি গড়িয়া থাকে, অথবা ঘরবাড়ি তৈয়ারির জন্য পাথর কাটিয়া দিনে বার আনা চৌদ্দ আনা রোজগার করে। ইহাদেরই মধ্যে একজনের নাম ছিল রাম মহারাণা।

অল্প বয়স, দেখিতে সুশ্রী, মাথার চুল লম্বা করিয়া রাখিত। গান গাহিতে ভালবাসিত, একটু আধটু যাত্রাও করিত। রামের সহিত আমার পরিচয় হঠাৎ হইয়াছিল। কণারকের মন্দিরে একবার জনৈক সৌখিন ভদ্রলোক কিছু মূর্তির নকল গড়াইবার জন্য রামকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে রামের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। রামের হাতের দক্ষতা দেখিয়া খুব আশ্চর্য হইয়াছিলাম! নরুনের মত কয়েকটি যন্ত্র লইয়া আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত রাম অল্পক্ষণের মধ্যে একটি পাথরের ঢেলাকে সজীব করিয়া তুলিত। অথচ এ জিনিসের আদর ছিল না। লোকে হয় জগন্নাথের মূর্তি চাহিত, নয়তো পুরীর মন্দিরে নরনারীর কামভাবের যে সকল মূর্তি আছে, চুপি চুপি তাহারই প্রতিকৃতি গড়াইয়া লইত।

রামের কিছু অর্থাগম এই দিক দিয়া হইত। আমি শিল্পশাস্ত্রের বিদ্যা আহরণ করিবার জন্য রামের বাড়ি প্রায়ই যাইতাম, এবং সেও আমাকে স্নেহ করিয়া দাদা বলিয়া ডাকিত। যতই আলাপ হইতে লাগিল ততই বুঝিলাম রাম যথার্থই একজন গুণী লোক। অশ্লীল মূর্তি বিক্রয় করিয়া খায় বটে, কিন্তু সে শুধু খাইতে পায় না বলিয়াই। নয়তো তাহার প্রাণ সত্যই শিল্পের জন্যই কাঙাল ছিল।

নিজে শিল্পীর ছেলে ; অল্প বয়স হইতে ছেনি ও হাতুড়ি ধরিতে শিখিয়াছে। বাপ পিতামহ যেমন করিয়া পুরীর বা ভুবনেশ্বরের মন্দির রচনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই কৌশল বংশপরম্পরায় সেও কিছু শিখিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য দেশের শিল্পের মধ্যে যথার্থ যাহা সুন্দর তাহা সহজেই তাহাকে আকৃষ্ট করিত। একদিন বিলাতী কয়েকখানি মূর্তির চিত্র দেখাইতেই রাম আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "দাদা আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে চল, আমি এই রকম মূর্তি গড়া শিখব।" তাহাকে বলিলাম, "তোমরা যে শিল্প জান, তাহাই বা কম কিসে ? তুমি কেন পরের শিল্প শিখবে ?" রাম দুঃখ করিয়া বলিল, "কেউ চায় না যে দাদা। দেখুন না, বড় লোকেরা কতকগুলো খারাপ বিলাতী ছবি পাঁচ টাকা দিয়ে কিনবে, আর আমার মূর্তি কেনার সময়ে দশ আনা দেবে কি ন' আনা দেবে, এই নিয়ে ঝগড়া করবে। বলে ন' আনাই তোর ঢের, ও আর করতে কতক্ষণ সময় লেগেছে।"

রাম মহারাণার হৃদয়ে সমাজের এই তাচ্ছিল্য সর্বদা কাঁটার মত বিঁধিত। নিজের শিল্প যে ভাল, এ বিষয়ে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিদেশী শিল্প যে খারাপ এমন ধারণা তাহার মনে কোনও দিন স্থান পায় নাই। কেবল শহরের ভদ্রলোকেরা দেশী বা বিদেশী শিল্পের বিন্দু-বিসর্গ না বুঝিয়াও অতি খেলো ধরনের বিদেশী ছবি মহা-আড়ম্বরের সহিত ঘরে টাঙাইয়া রাখিত, এইটাই সে বরদাস্ত করিতে পারিত না! বড় লোকদের উপর এই জন্য তাহার কেমন একটা রাগ হইয়া গিয়াছিল।

অথচ মানুষের ভালবাসার জন্য ও একটু সম্মানের জন্য রাম কতই না কাঙ্গাল ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি আসিয়া রাম হঠাৎ এক হারমোনিয়ম চাহিয়া বসিল। কোথায় পাই ? অবশেষে এক প্রতিবেশীর বাড়ি হইতে হারমোনিয়ম সংগ্রহ হইল এবং রাম সেই অন্ধকার সন্ধ্যায়

নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া বহু গিট্‌কারী সহযোগে নানাবিধ দুর্বোধ্য তান আবৃত্তি করিতে লাগিল। এমনি করিয়া মাঝে মাঝে রামের উৎপাত সহ্য করিতে হইত।

কিন্তু ভদ্রসমাজে মিশলেই তো ভদ্রলোকেরা খাইতে দেয় না। রামের অর্থাগমের চেষ্টা করা দরকার। কলিকাতায় কয়েকজন বন্ধু রামের গড়া মূর্তি দেখিয়া তাহা কিনিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। রাম মূর্তি গড়িয়া আমার কাছে রাখিয়া যাইত, আমিও সুযোগ বুঝিয়া বন্ধুবান্ধব-দের ঘাড়ে তাহা চাপাইতাম। তবে এভাবে আমদানি বেশী হইত না। কখনও হইত, কখনও বা এক পয়সাও জুটিত না। রামের কিন্তু উহার ফলে কাজের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে ভুবনেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের গায়ে যে সকল অপূর্ব মূর্তি ও লতাপাতার সাজ আছে তাহারই প্রতিলিপি গড়িতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই আমার ঘরে একটা যাদুঘরের মত সামগ্রী জমিয়া উঠিল। রাম মাঝে মাঝে বলিত, "দাদা, হাতে কাজ এলে কি রকম মনে হয় জানেন ? সমস্ত পুরী শহরটার ঘর-বাড়ি যেখানে যা কিছু আছে, সব আমার কাজ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারি।" তাহার উৎসাহ দেখিয়া আমার ভালও লাগিত, দুঃখও হইত। কেই বা ইহাদের আদর করিবে, কেই বা ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিবে ?

একদিন অপরাহ্ণে ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি এমন সময়ে শুষ্ক মুখে রাম মহারাণা আসিয়া হাজির হইল। তাহার মুখ দেখিয়া কেমন সন্দিগ্ধ হইলাম। কিছু না বলিয়া সে তাহার গড়া মূর্তিগুলি ফিরিয়া চাহিল। তাহার দু-একদিন পূর্বে রাম টাকার জন্য একবার আসিয়াছিল, কিন্তু কোনও মূর্তি বিক্রয় না হওয়ায় তাহাকে কিছু দিতে পারি নাই। আজ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে

ভরসা হইল না। মূর্তিগুলি ভিতরের আলমারি হইতে রামের হাতে বাহির করিয়া দিলাম।

রাম নিঃশব্দে সেগুলি লইল, এবং পরমুহূর্তেই মাটির উপর আছাড় দিয়া সেগুলিকে টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। তাহার পর সেগুলি কুড়াইয়া দূরে ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া আমি কিছু বলিতে পারিলাম না ; সেও যে-ভাবে আসিয়াছিল তেমনি ভাবেই ফিরিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে রাম মহারাণার বাড়ি উপস্থিত হইলাম। দেখি সে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্টমনে একটি মূর্তি খোদাই করিতেছে। আমাকে দেখিয়া প্রথমে সে লজ্জায় কোনও কথা বলে নাই। তারপর আমি যখন পূর্বদিনের ঘটনার কথা উত্থাপন করিলাম তখন সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ বাদে বুঝিতে পারিলাম কে তাহার এক ভাইকে কাজের জন্য কিছু টাকা দাদন দিয়াছিল ; এবং সেই ব্যাপার লইয়া সে নাকি কাল তাহাকে অপমান করে। এই ব্যাপারে মর্মাহত হইয়া সে নিজের সব মূর্তিগুলি ভাঙিয়া দিয়াছে। দুঃখ করিয়া রাম বলিল "কেউ আমাদের কাজ চায় না। যে সিঁড়ির পাথর কাটে সেও বার আনা পায়, আমি মূর্তি গড়লেও বার আনা পাই।" সেই দুঃখেই রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের কাছে কোনও ভালবাসা, কোনও আদর সে পায়-নাই। তাহার উপর রামের লোভ ছিল বটে, কিন্তু দেশের লোক তাহাকে খাইতে পর্যন্ত দেয় নাই। নিজের কথা ঠিক রাখিতে পারে নাই বলিয়া নিষ্ঠুরভাবে তাহারা বাড়ি বহিয়া অপমান পর্যন্ত করিয়া গিয়াছে।

সেই আমার রামের সঙ্গে শেষ দেখা। তাহার পর বহুদিন ভ্রমণের নেশায় দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। কয়েক বৎসর পরে যখন পুনরায়

ফিরিয়া গেলাম তখন শুনিলাম রাম মহারাণার মৃত্যু হইয়াছে। পাথুরিয়া-পল্লীর একজন কারিগরের নিকট শুনিলাম যে রাম উপর্যুপরি তিন দিন অনবরত গঞ্জিকা সেবন করিয়া একরকম আত্মহত্যাই করিয়াছে। রামের বাড়িতে তাহার বিধবা স্ত্রী সকালে দাওয়ায় গোবর লেপিতেছিল, সে আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া প্রণাম করিল বটে, কিন্তু কি হইয়াছিল, একথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার আর কথা সরিল না।

দেশসেবক

নরেন ঘোষাল ও আমি একই ক্লাসে পড়িতাম বটে, তবে বিভিন্ন কলেজে। উভয়ের বাসা পাশাপাশি ছিল বলিয়া আমাদের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। খুব ভাল খেলোয়াড় বলিয়া নরেনবাবুর খ্যাতি ছিল, এবং সেইজন্য পাস করিবার পর ভাল চাকরি পাইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। চাকরি লাভ করিবার পর কিছু দিন আর তাঁহার খবর পাই নাই। তাঁহাকে আপিসের কাজে সর্বদাই বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।

ইহার পর পুনরায় যখন নরেন ঘোষালের সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎ হইতে লাগিল তখন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন এবং কলিকাতায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় আপিসে কোন একটা কাজের ভার লইয়াছেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়া নরেনবাবু প্রবল গান্ধীভক্ত হইয়া উঠিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ছোট কাপড় ধরিলেন, মাছ মাংস ছাড়িয়া দিলেন, এমন কি মধ্যে কিছু দিন ধরিয়া শুধু কাঁচা ফলমূল খাইয়াই থাকিয়া গেলেন। এই সকল অত্যাচারের ফলে তাঁহার বলিষ্ঠ শরীর শীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সে কথা তাঁহাকে বলিয়া কিছুতেই বুঝান যাইত না। বুঝাইবার চেষ্টা করিলে বলিতেন যে উহাতেই মনের মধ্যে তিনি নাকি পরম সুস্থতা অনুভব করিতেছিলেন।

নিজের উপর এইরূপ অত্যাচারের ফলে নরেনবাবুর মধ্যে আমরা ক্রমে কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। তিনি পূর্বাপেক্ষা কেমন

যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মধ্যে ক্ষমাগুণ কমিয়া গেল। হয়তো নরেনবাবু নিজেও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন দুঃখ করিয়া আমার কাছে বলিলেন যে শহরে আবদ্ধ থাকিয়াই তাঁহার এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে। দেশের নেতাদের মিথ্যাচার দেখিতে দেখিতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে শহরের নেতারা নিজের ছাড়া পরের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, পরকে তাহারা যথার্থ ভালবাসিতে শিখে নাই।

কথাটা সত্য কিনা জানি না, তবে শহরে থাকিয়া নরেনবাবুর যে ক্ষতি হইতেছিল তাহা আমরা বন্ধুমহলে বলাবলি করিতাম। কোথাও বাহিরে গেলে তাঁহার উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল। এমন সময়ে কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে বর্ধমান জেলার দক্ষিণদিকে দুইটি থানা দামোদরের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। তাহা শুনিয়াই নরেনবাবু কিছু হোমিওপ্যাথি ঔষধপত্র লইয়া বর্ধমানের অভিমুখে রওনা হইলেন। সঙ্গে শিশির নামে একটি বালকও গিয়াছিল।

বর্ধমান পৌঁছিয়া কংগ্রেসের নির্দেশমত তাঁহারা মাধবীডাঙা নামে একটি গ্রামে একখানি ঘর লইয়া রিলিফের কাজ আরম্ভ করিলেন। এই সকল কাজে শিশিরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। সে জলকাদা ভাঙিয়া গ্রামের পর গ্রাম প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ি স্বচক্ষে দেখিয়া টিকিট বিতরণ করিয়া আসিত এবং সপ্তাহশেষে সাত গ্রামের লোককে টিকিটের নির্দেশমত চাল, ডাল ও কাপড় বিতরণ করিত। এক জায়গায় বসিয়া কাজ করিতে বলিলেই তাহার বিপদ হইত।

যতদিন রিলিফের কাজ চলিতে লাগিল, ততদিন মাধবীডাঙার আশ্রমে কোন দিন রন্ধন হইত, কোন দিন বা হইত না। শিশির হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছিল যে প্রত্যহ রন্ধন করা একটা কুসংস্কার। যেদিন রান্না হইত

না সেদিন শিশির এবং নরেনবাবু উভয়েই নিকটস্থ সতীশ মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে খাইয়া আসিতেন। সতীশবাবু মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক হইলেও অতিথিসজ্জনের সেবা করিতে বড় ভালবাসিতেন। প্রায় পনর বৎসর পূর্বে তাঁহার স্ত্রী ছোট মেয়েটিকে রাখিয়া মারা যান। সেই অবধি তিনি একরকম সন্ন্যাসীর মতই বাড়িতে থাকিতেন। নরেনবাবুর খাইবার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া তিনি একদিন নিজেই বলিলেন, "আপনারা দেশের সেবা করিবেন, আর আমরা আপনাদের সেবা করিব, এমন ভাগ্য কি আমাদের নাই?" সেই হইতে শিশির এবং নরেনবাবু মাসের মধ্যে পনর দিন সতীশবাবুর বাড়িতে আহার করিতেন। সতীশবাবুর কন্যা মায়ার সঙ্গে শিশিরের খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল, এবং মায়াকে খুশী করিবার জন্য সে প্রায়ই নরেনবাবুর বাগ্মিতা ও কর্মপটুতার সম্বন্ধে গল্প করিত।

প্রায় তিন মাসের মধ্যে রিলিফের কাজ শেষ হইয়া গেল। তখন নরেনবাবু মাধবীডাঙার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে খদ্দরপ্রচার ও শিক্ষা-বিস্তারের কাজে মন দিলেন। সতীশ মুখুয্যের বাড়ি খাওয়া তিনি নিষেধ করিয়া দিলেন, এবং প্রত্যহ আশ্রমে রন্ধনের ব্যবস্থা করিলেন।

ইতিমধ্যে নরেনবাবুর মনে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তিনি নিরামিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সহজভাবে কাপড়-চোপড় পরিতেন এবং সকলের সঙ্গে সহৃদয়তার সহিত মিশিতে পারিতেন। তাঁহার ঐ সময়ের ডায়েরীর মধ্যে দেখিয়াছি কঠোরীবৃত্তি যে তাঁহার পক্ষে মিথ্যা ইহা তিনি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেশের দারিদ্র্য দেখিয়া তিনি দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেন নাই, জীবজন্তুর প্রতি প্রেমের বশে নিরামিষাশী হন

নাই। নিজের বলিষ্ঠ স্বভাবের বশে লোকের দোষগুণ তাঁহার চিত্তে অতিকায় আকারে দেখা দিত, সেইজন্য তিনি নিজেকে ঐরূপে শাসন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অথচ এতদিন তিনি নিজেকে সর্বদা অন্যরূপ বুঝাইয়া আসিতেছিলেন। যখন তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন, তখনই এই সমস্ত কঠোর অনুষ্ঠান পরিহার করিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটি কঠোর ভাব থাকিয়া গিয়াছিল। হয়তো তাহার জন্যই তিনি শিশিরকে একদিন রূঢ়ভাবে সতীশবাবুর বাড়িতে খাওয়ার কথা বারণ করিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরী পড়িয়া আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল।

যাহাই হউক, মাধবীডাঙা আশ্রমের কাজ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া গেল। পর বৎসর আশ্বিন মাসে বর্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়া ভীষণ আকারে দেখা দিল। শুধু যে জ্বর হইত তাহা নহে। অনেকক্ষেত্রে জ্বর বেশী না উঠিয়া দুই তিন দিনের মধ্যে রোগী হঠাৎ ভুল বকিতে আরম্ভ করিত এবং তাহার পরে দু-একদিন অচৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া মারা যাইত। নরেনবাবু এবং শিশির সব কাজ বন্ধ করিয়া রোগীদের চিকিৎসা এবং সেবায় লাগিয়া গেলেন। সারা দিনরাতের মধ্যে তাঁহাদের আর বিশ্রামের সময় থাকিত না। সতীশ মুখুয্যে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহাদের খাইবার ব্যবস্থা পুনরায় নিজের বাড়িতে করিয়া লইলেন। একদিন খাইতে আসিয়া নরেনবাবু মায়ার সন্ধান লইয়া জানিলেন যে সে বাউরী পাড়ায় একজন বৃদ্ধা রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়াছে। বৃদ্ধার বয়স অনেক, বাঁচিবার কোনও আশা নাই। তবু দিন নাই, রাত নাই, সেই সংকীর্ণ অন্ধকার কুটিরে থাকিয়া মায়া একা বৃদ্ধার সেবা করিতে লাগিল। একাদশী

তিথিতে গভীর রাত্রে বাউরী বৃদ্ধাটি মারা গেল। ভোরের সময়ে বাউরীরা শব লইয়া গেলে মায়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

বাড়ি আসিয়া সে শুনিল যে আশ্রমে নরেনবাবুর সামান্য অসুখ করিয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে শিশির আসিয়া সতীশবাবুকে বলিয়া গেল যে নরেনবাবুর জ্বর ভাল বোধ হইতেছে না, নিকটস্থ গ্রামের একজন এম. বি. ডাক্তারকে ডাকিয়া আনা প্রয়োজন। ডাক্তারবাবু সেদিন আসিতে পারিলেন না, তাহার পরদিনও না। তৃতীয় দিনে আসিয়া শিশিরের নিকট রোগের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন যে টাইফয়েড বলিয়া মনে হইতেছে, খুব ভাল করিয়া শুশ্রূষা হওয়া দরকার। সতীশবাবু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজে যথাসাধ্য দেখাশুনা করিতে লাগিলেন এবং শিশিরকে কলিকাতায় কংগ্রেস আপিসে সংবাদ দিতে বলিলেন। এদিকে মায়া তাহার পিতাকে ধরিয়া বসিল যে শিশির একা কিছুই করিতে পারিবে না, তাহাকে আশ্রমে সেবার জন্য যাইতে দিতেই হইবে। সতীশবাবু প্রথমে লোকলজ্জার ভয়ে ইতস্তত করিতে-ছিলেন, কিন্তু শেষে মেয়ের ভাব দেখিয়া আর আপত্তি করিলেন না। মায়া দিবারাত্র নরেনবাবুর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

কিন্তু অষ্টম দিন হইতেই রোগীর বিকার উপস্থিত হইল। বিকারের ঘোরে রোগী সময়ে সময়ে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতেন। একা শিশির তাঁহাকে সামলাইতে পারিত না। দুইজনে মিলিয়া কোনও প্রকারে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে হইত। আবার সময়ে সময়ে রোগী নিস্তব্ধ অবস্থায় অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে কত কথা বলিয়া যাইতেন। একা থাকিলে মায়া তাঁহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা শুনিবার চেষ্টা করিত। কিছু বুঝিতে পারিত, কিছু পারিত না। একদিন তাহার মনে হইল নরেনবাবু তাহার নাম করিতেছেন! গত বৎসর পূজার সময়ে

পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিবতলায় পূজা দেখিতে গিয়া মায়ার সহিত নরেনবাবুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মায়ার নাসিকা দীর্ঘ ছিল। মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে এমন সময় হঠাৎ নরেনবাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, "উনি নাকেশ্বর শিব, ভাল করে পূজা দাও।" মায়া উপহাসটা না বুঝিয়া ভাল করিয়া ফুল বিল্বপত্র দিতেছে দেখিয়া নরেনবাবু হাসিতে লাগিলেন। মায়ার সে কথা মনে আছে। আজ মনে হইল জ্বরের বিকারে রোগী সেই কথা বলিতেছেন। মনে হইল নরেনবাবু যেন তাহার নাম ধরিয়া সেই শিবতলার কথা বলিতেছেন। কিন্তু মায়া সব কথা ঠিকমত ধরিতে পারিল না।

দুই দিন পরে আবার যখন ডাক্তারবাবু আসিবার সময় পাইলেন, তখন তিনি সতীশবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে রোগীর অবস্থা ভাল মনে হইতেছে না; আত্মীয়স্বজন কেহ থাকিলে শীঘ্র খবর দেওয়া প্রয়োজন। কাশীতে নরেনবাবুর মায়ের কাছে সংবাদ দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি সংবাদ পাইলেন কিনা বুঝা গেল না।

এদিকে কলিকাতায় কংগ্রেস আপিসে শিশিরের চিঠি দুইদিন পড়িয়া থাকার পর একদিন একজন স্বেচ্ছাসেবক সন্ধ্যার সময়ে খোঁজ করিয়া আমার বাসায় তাহা দিয়া গেল। আমি সংবাদ পাইবামাত্র বর্ধমান রওনা হইলাম। কিন্তু স্টেশন হইতে এগার মাইল দূরে মাধবীডাঙার আশ্রমে যখন পৌঁছিলাম তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম ঘরের মধ্যে কোনও আলো নাই, কোনও লোকজন দেখা যাইতেছে না, কে যেন আলোটি কমাইয়া দরজার বাহিরে রাখিয়া দিয়াছে।

আমি শিশিরের নাম ধরিয়া ডাকিতেই সতীশবাবুর কন্যা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সেই অল্প আলোতেও তাহার অত্যন্ত শুষ্ক এবং উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম; কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে সে নিজেই বলিল, "নরেনবাবু তো নেই। সন্ধ্যার সময়ে সবাই তাঁকে নিয়ে গেছে।"

আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সকালে ঘাট হইতে যখন সকলে ফিরিয়া আসিল তখন সতীশবাবুর কাছে শুনিলাম যে সন্ধ্যার মুখেই নরেন মারা গিয়াছে। শিশির প্রভৃতি সকলে চলিয়া গেলেও তাঁহার কন্যাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাওয়া যায় নাই।

অধ্যাপক

সেবার ভ্রমণের নেশায় বোম্বাই-এর দক্ষিণে কানাড়া জেলায় গিয়াছিলাম। পোষাক-পরিচ্ছদ যতদূর সম্ভব অবাঙালীর মত করিয়াও নিস্তার পাওয়া গেল না। গায়ে খদ্দর দেখিয়া একজন পুলিশের কর্মচারী সঙ্গ লইলেন। কি করি, কেন আসিয়াছি, কত দিন থাকিব, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হয়রান হইয়া গিয়াছিলাম ; কিন্তু কানাড়ায় আসিয়া এবার কিছু লাভ হইল। কানাড়ার বাজারে সাধারণতঃ যে সব খাবার পাওয়া যায়, তাহা আমাদের পক্ষে অচল। তাহার উপর ভাষার এত প্রভেদ যে যাহা চাই তাহা সম্মুখে দেখিতে না পাইলে বলিয়া বুঝান বড় শক্ত। এমন অবস্থায় পড়িয়া আমার পাহারাওয়ালাটির শরণাপন্ন হইলাম। লোকটি বোধ হয় ধর্মভীরু ছিল, সহসা আমার অপকার করিল না। দোকানদারকে কানাড়ী ভাষায় আমার প্রয়োজনের কথা বুঝাইয়া দিল।

যে গ্রামে গিয়াছিলাম তাহার প্রায় চারি ক্রোশ দূরে কতকগুলি প্রাচীন গুহা এবং মন্দির বর্তমান ছিল। সেখানে দুই তিন দিন থাকিতে হইবে ভাবিয়া কিছু চিন্তিত হইলাম। কিন্তু মন্দিরে পৌছিয়া অকস্মাৎ জনৈক বাঙালী ভদ্রলোককে দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। পরিচয়ে জানিলাম ইনি বাঙলার কোনও কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। কাগজপত্রে অবশ্য তাঁহার নাম দেখিয়াছিলাম কিন্তু বিদেশে তাঁহার সহিত এমনভাবে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইবে তাহা কখনও ভাবি নাই।

সারাদিন ইতস্তত মন্দির ও বৌদ্ধ কীর্তিরাজি পরীক্ষা করিবার পর সন্ধ্যার সময় ডাকবাংলায় অধ্যাপক মহাশয়ের অতিথি হইলাম। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার কাছে অনেক গল্প শুনিলাম। কথায় কথায় আরও প্রকাশ পাইল যে অধ্যাপক মহাশয় শুধু ইতিহাসের গবেষণার জন্যই এদিকে আসেন নাই। নিকটবর্তী এক স্থানে নূতন একটি ইলেকট্রিক কোম্পানী খোলা হইতেছিল। শেয়ার কিনিবার পূর্বে লাভলোকসানের সম্ভাবনা যাচাই করিবার জন্য ইতিমধ্যে তিনি সেদিকে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে এদিকে আসিবার সেইটি প্রধান কারণ হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণা করার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। এবং সে জন্য তিনি কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট যাতায়াতের খরচ বাবদ দেড় শত টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। সঙ্গে একজন চাপরাসীও ছিল। সে একাধারে চাকর এবং বামুনের কাজ করিত। তাহার ব্যয়ও অবশ্য কর্তৃপক্ষ করিতেছিলেন।

পরদিন আমি নিজের কাজে নানাবিধ ফোটো তুলিয়া বেড়াইলাম। অধ্যাপক মহাশয়ও সঙ্গে ঘুরিলেন, তবে পূর্বাপেক্ষা কম। শরীরের গুরুত্বের জন্য তিনি বেশী ওঠানামা পছন্দ করিতেন না; অথচ ইতিহাসের মালমসলা কখনও পাহাড়ের উপরে, কখনও বা মন্দিরের চূড়ায় অঙ্কিত থাকে। তিনি সেইজন্য দূর হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সমস্ত পদার্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আমরা যে গ্রামে গিয়াছিলাম তাহার অনতিদূরে একটি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল। অধ্যাপক মহাশয় ইতিপূর্বে শিলালিপি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সেদিন ধরিয়া

বসিলেন যে শিলালিপি সমেত তাঁহার একখানি ফোটো তুলিয়া দিতে হইবে। অনেকে নাকি বলিয়া থাকে যে তিনি কোথাও না গিয়াই ইতিহাস লেখেন। সেই অপবাদ দূর করিবার জন্য তাঁহার ছবি তুলাইবার বাসনা হইল। আমার অবশ্য আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। তখন তিনি চাপরাসীকে ডাকবাংলা হইতে ধোয়া কাপড় ও সিল্কের পাঞ্জাবি আনিতে বলিলেন। অতঃপর সেই বেতবনের মধ্যে প্রসাধন সমাপন করিয়া শিলালিপির পাশে উপবিষ্ট হইলেন। আমিও স-অধ্যাপক প্রস্তরফলকের একখানি ছবি তুলিয়া লইলাম।

তাহার পরদিন আমাদের ফিরিবার পালা। অধ্যাপক মহাশয়ের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতে সারা সকালটা কাটিয়া গেল। কত রকম জিনিসই তাঁহার সঙ্গে ছিল। শরীরকে সুখে রাখিবার জন্য যেন একটা যুদ্ধযাত্রায় চলিয়াছেন।

যাহা হউক, দুই দিনের কাজে অধ্যাপক মহাশয় বেশ খুশী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেড়শত টাকার যে সদ্ব্যয় হইয়াছে এ বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দহ ছিল না। কেবল দুঃখ ছিল এই, কেন কর্তৃপক্ষ তাঁহার গবেষণার জন্য দেড় শতের পরিবর্তে চারিশত টাকা মঞ্জুর করেন নাই, তাহা হইলে এই সুযোগেই তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত সারিয়া আসিতে পারিতেন।

রেলস্টেশন হইতে আমাদের ডাকবাংলা প্রায় চার ক্রোশ দূরে ছিল। সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া গাড়ি রওনা করিয়া দেওয়া হইল। আমার জিনিসপত্র মালবোঝাই গরুর গাড়িতে দিয়া আমি অধ্যাপক মহাশয়ের গাড়ির সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলাম। পার্বত্য পথে আট মাইল গরুর গাড়িতে যাইবার মত দুঃসাহস আমার ছিল না।

কিছুদূর চলিতে চলিতে সূর্য অস্ত গেল এবং ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার

ঘনাইয়া আসিল। অধ্যাপক মহাশয়ের মনেও বোধ হয় কেমন একটা উদাস ভাব আসিল। তিনি "বিফল জনম, বিফল জীবন" বলিয়া একটি গান ধরিলেন। তাঁহার গলা বেশ সুমিষ্ট ছিল, গানের শিক্ষাও ছিল। সন্ধ্যার আবেশে গানটি বড়ই মধুর লাগিল। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছিয়া হঠাৎ আমার কেমন একটু ঠাট্টা করিবার প্রবৃত্তি জাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, ও গানটা কি আপনার মুখে মানায় ?" তিনি বলিলেন, "কেন ভাই, আমাদের কি তুমি বড়লোক ব'লে ভাবলে ? ইউনিভার্সিটির খবর তো জান না। সেখানে হাজার টাকা মাহিনা দেয়। আমরা তো তার অর্ধেকও পাই না।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই ইলেকট্রিক কোম্পানিটা কি রকম দেখলেন ?" তিনি বলিলেন, "কিচ্ছু নয় ভাই। কাগজেই তাদের কোম্পানি আছে। গিয়ে দেখলাম কাজে কিছুই হয় নি। স্বদেশী বলে টাকা দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু দিতে ভরসা হলো না। স্বদেশীর হিড়িকে কত কোম্পানি যে ঠকিয়ে দেশের সর্বনাশ করছে, তার ঠিকানা নেই।"

এতদিনে কোম্পানিটার সর্বনাশ হইয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু পথে খবর লইয়াছিলাম অধ্যাপক মহাশয় এখনও সুস্থদেহে চাকরি করিতেছেন ; এবং হয়তো বা দেশকে নানাপ্রকার সর্বনাশের হাত হইতে কোনও রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

রঘুয়া

ডাক্তারদের পরামর্শে বাঙলা দেশ হইতে বহু রোগী প্রতি বৎসর পুরীর সমুদ্রতীরে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই দুরারোগ্য ব্যাধি থাকে এবং বৎসরের পর বৎসর সেখানে স্বর্গদ্বারের শ্মশানঘাটে অনেকেরই পরিণতিলাভ হইয়া থাকে।

সেই শ্মশানঘাটে রঘুয়া নামে এক ব্যক্তি বাস করে। রোগা, শুষ্ক কাঠের মত চেহারা, কপালে একটি বড় সিঁদুরের টিপ, গলায় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, অত্যন্ত ময়লা বড় বড় দাঁত, তাহার চক্ষু সর্বদা গঞ্জিকাসেবনে একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। লোকটি মড়া-পোড়ানোর কাজে একেবারে সিদ্ধহস্ত। আমরা স্বর্গদ্বারে কাহাকেও লইয়া গেলে গোড়া হইতেই রঘুয়ার শরণাপন্ন হই। সে চিতা সাজাইয়া, যথাকর্তব্য সম্পাদন করিয়া আমাদের পরিশ্রম লাঘব করিয়া দেয় এবং তৎপরিবর্তে দুই চারি আনা বকশিশ লাভ করিয়া থাকে। শোনা যায়, রঘুয়া এক সময়ে কোনও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পুরীতে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্মশানেই থাকিত এবং গুরুর নিকট প্রসাদ লাভ করিয়া তাহার দিন চলিয়া যাইত। যে সকল ব্যক্তি শবদাহের জন্য শ্মশানে আসিতেন, রঘুয়া তাঁহাদের কিছু কিছু সাহায্য করিত। ক্রমশঃ এ কার্যে তাহার দক্ষতা জন্মায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইপয়সা আমদানিও হইতে থাকে। অবশেষে রঘুয়ার গুরু যখন অন্যত্র যাইবার প্রস্তাব করিলেন তখন সে গুরুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বর্গদ্বারেই রহিয়া গেল। সেই হইতে সে স্বর্গদ্বারের একজন বিশিষ্ট পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিছুদিন আগে তুপুরবেলায় খাইয়াদাইয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে একটি বাড়ি হইতে ডাক আসিল, কাহারও মৃত্যু ঘটিয়াছে, শ্মশানে লইয়া যাইতে হইবে। গিয়া দেখি, অল্পবয়স্ক একজন যুবক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। লোকজন বেশী পাওয়া যায় নাই, তবে শ্মশান হইতে বেশী দূরে নয় বলিয়া আমরা অল্প কয়েকজনে স্বচ্ছন্দে তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া মনে হইল। দাহ অনেক করিয়াছি এবং মৃত্যুও সংখ্যায় কম দেখি নাই। কিন্তু যুবকটির শবদেহের কথা অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। আমরা গিয়া দেখিলাম মৃত্যুর পূর্বেই তাহাকে রোগশয্যা হইতে বাড়ির কাঁচা উঠানে একখানি ছেঁড়া মাতুরের উপরে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। হয়তো বিছানাপত্র লোকসান যাইবার ভয়েই আত্মীয়স্বজন এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। কাঁচা উঠানে শুইয়া থাকার ফলে লাল পিঁপড়ায় শবদেহটি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার জন্য আমাদিগকে অবশেষে কম বেগ পাইতে হয় নাই।

যাক সে কথা। আমরা যথারীতি দেহটি বহন করিয়া স্বর্গদ্বারে পৌঁছিলাম এবং রঘুয়াকে ডাকিয়া তাহার উপর সমস্ত কাজের ভার অর্পণ করিলাম। চিতা যখন বেশ ধরিয়া উঠিয়াছে রঘুয়া তখন একটু দম লইবার জন্য বালির উপরে আমাদের কাছে আসিয়া বসিল। অনেকদিনের আলাপ, তাই তাহাকে সংসারের হালচাল কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "রঘু, তোমার কাজকর্ম কেমন চলিতেছে?" রঘুয়া মুখে হতাশার ভাব আনিয়া বলিল, "কই বাবু, আজকাল দিন বড় খারাপ যাইতেছে, খরিদ্দার একেবারেই নাই।" আমি তাহাকে বলিলাম, "বল কি রঘু? তোমার এখানে খরিদ্দার নাই, সে তো ভাল কথা। লোকে তাহা হইলে সুস্থই

আছে বল।" রঘুয়ার কিন্তু আফসোসের সীমা নাই, সে বলিল, "বাবু, আমরা গরীব মানুষ, দিন কোন রকমে চলিয়া যায়। কিন্তু ডাক্তারদের কারবার কেমন করিয়া চলিতেছে, তাই ভাবি।" আমি হাসিয়াই অস্থির হইলাম। কাহারও সর্বনাশ কাহারও বা পৌষ মাস। লোকে স্বর্গদ্বারে ঘন ঘন আসুক ইহাই রঘুয়া কামনা করিয়া থাকে, যাহাতে তাহার অন্তত গঞ্জিকা সেবনের পয়সাটুকুর অভাব না হয়!

রঘুয়া বরাবর স্বর্গদ্বারের শ্মশানঘাটে একাই বাস করিত। একবার কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, রঘুয়ার অনেকগুলি চেলা জুটিয়াছে এবং সকলে মিলিয়া অহোরাত্র গঞ্জিকাসেবন এবং মদ্যপান করিতেছে। মনে কেমন খট্‌কা লাগিল, রঘুয়া কি তাহা হইলে শবদাহের কাজ ছাড়িয়া গুরুগিরির ব্যবসায় ধরিয়াছে? রঘুয়াকে আড়ালে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারখানা কি? রঘুয়া খুলিয়া সব বলিল। কয়েকদিন পূর্বে একজন মারোয়াড়ীর শব, দাহের জন্য আসিয়াছিল। মারোয়াড়ীরা সাবধানী জাত, মৃত্যুশয্যাতেও অর্থসম্পত্তির কথা ভোলে না, রঘুয়ার তাহা জানা ছিল। সেইজন্য সে মৃতদেহের সহিত পরিত্যক্ত বিছানাপত্র ছিঁড়িয়া গবেষণা আরম্ভ করিল। সেই সন্ধানের ফলে বালিশের মধ্যে সেলাই করা একশত টাকার নোট লাভ হয়। সেই টাকার দ্বারা সম্প্রতি রঘুয়া গঞ্জিকা এবং কারণবারির ভাণ্ডার খুলিয়াছে এবং পিপাসু ভক্তের দল তাহার চতুর্দিকে কয়েকদিন হইল ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে। আমি তাহাকে সৎপরামর্শ দিবার ছলে বলিলাম, "টাকা লইয়া কিছু ব্যবসায় আরম্ভ কর না কেন?" রঘুয়ার কিন্তু তাহাতে আদৌ মত ছিল না। সে বলিল, "বাবু, যতদিন টাকা আছে ততদিন এমনই করিয়া চলিবে, ফুরাইয়া গেলে যেমন ছিলাম তেমনই আবার হইব। ফের যদি কোনও দিন টাকা পাওয়া যায়, তখন আবার ভাল দিন আসিবে।"

বাস্তবিক রঘুয়ার মত এমন নির্ভাজ আশাবাদী লোক কমই দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। আজ বাদে কাল কি হইবে কখনও সে ভাবিত না, ভবিষ্যতের জন্য বন্দোবস্ত করার বিড়ম্বনা কোন দিনই সে পোয়ায় নাই। টাকা জমাইয়া রাখার বালাই তাহার ছিল না, একখণ্ড পুরাতন বিছানা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টায় সে নিজেকে কখনও পীড়িত করিত না। ভালভাবেই হউক আর মন্দভাবেই হউক বর্তমানের মুহূর্তটিকে মনের আনন্দে কাটাইয়া যাইতে পারিলেই সে খুশী থাকিত।

ইতিহাসের গবেষণা

১৯৫২ সালের ঘটনা। তখন ভারতবর্ষময় হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। কাশী শহরের হাট-বাজার সবই বন্ধ। সদর রাস্তায় সশস্ত্র গুর্খা পাহারা বসিয়াছে, কিন্তু গলিঘুঁজির ভিতর চলাফেরা করা আদৌ নিরাপদ নহে। যাহারই ঘরে দুমুঠো খাইবার আছে, সে চালে-ডালে তাহাই সিদ্ধ করিয়া লয়, বাড়ির বাহির হয় না। যাহার ঘরে কিছু নাই তাহাকে বাহিরও হইতে হয়, তাহার বিপদও বেশী। এই তো শহরের অবস্থা।

বাঙালীটোলার এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে গোবর্ধন লাহা মহাশয়ের বাড়ি। গোবর্ধনবাবু সামান্য ঘড়ি-মেরামতের কাজ করিতেন। খরিদ্দারদের কাছে তাঁহার কিছু বাকি পাওনা ছিল, তাহা আদায় করিবার খুবই ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি ঘর হইতে বাহিরে একপা বাড়াইতে পারিতেন না। এমনই ভাবে কিছুদিন ঘোর উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়া গেল। ক্রমে শহরের আবহাওয়া পরিষ্কার হইল, লোকজন পুনরায় চলাফেরা আরম্ভ করিল, হাটবাজার খুলিল, গঙ্গার ঘাটে ভোরের বেলায় আবালবৃদ্ধার দল যথারীতি ফুলবিল্বপত্র সহযোগে পূজায় বসিতে লাগিলেন। সেই সময় নাগাদ গোবর্ধনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। গোবর্ধনবাবু ইতিহাসের গবেষণা করেন শুনিলাম, এবং তাঁহার কাছে গেলে বারাণসীর পুরাতন ইতিবৃত্ত অনেক শুনা যাইবে, সংবাদ পাইয়া একদিন সকালে তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইলাম।

কাশীর স্থানে স্থানে খুব পুরাতন পুষ্করিণী আছে। সেগুলিতে জল কম, উপরে ঘন শ্যাওলা পড়িয়া সবুজ হইয়া থাকে, পাশে কোনও পুরাতন বট বা অশ্বত্থের নীচে খণ্ডিত মূর্তি বা মসৃণ পাথর সিঁদুরে লেপিয়া রাখা থাকে। পথচারী যাত্রীগণ তাহার উপরে দুই এক ফোঁটা জল নিবেদন করিয়া যায়। সেইরকম এক প্রাচীন ঘাটের পাশে গোবর্ধন লাহা মহাশয়ের বাড়ি। বাহিরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—জি. লাহা—ওয়াচ এণ্ড ফাউন্টেন-পেন রিপেয়ার স্পেশালিষ্ট।

লাহা মহাশয়ের পিতা কুইন্‌স কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এবং যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া কাশীতে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি নিজের চেষ্টায় এই বাড়িখানি করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র এখন তাহা ভোগদখল করিতেছেন। বাড়ির পাশে একটি আস্তাবল, তাহাতে এক কালে গাড়ি ছিল, এখন নাই। আস্তাবলের দরজা বন্ধ, কিন্তু সামনে সবুজ একখণ্ড মাঠের পাশে গাড়ির একখানি ভাঙা চাকা পড়িয়া ছিল।

গোবর্ধনবাবুর প্রতিবেশী আমার এক আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম গোবর্ধনবাবু এক সময়ে নাকি সোৎসাহে সিনেমার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সস্তায় ফিল্ম সংগ্রহ করিয়া আস্তাবলের দরজায় একখানি বিছানার চাদর ভিজাইয়া টাঙাইয়া দিতেন, দর্শকগণ দুই আনা দর্শনী দিয়া সামনে ঘাসের উপর বসিয়া তাহা দেখিত। কিন্তু সস্তায় ইংরেজী ফিল্ম পাওয়া যায় নাই, দেশী ফিল্মের তখনও জন্ম হয় নাই। কিন্তু ফরাসী ফিল্ম পাওয়া গিয়াছিল, এবং তাহার সব কথাই ফরাসীতে লেখা বলিয়া অত্যল্পদিনের মধ্যে দর্শকের সংখ্যা কমিতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত গোবর্ধনবাবুকে ব্যবসা গুটাইয়া ফেলিতে হইল। সেই হইতে তিনি ঘড়ি এবং ফাউন্টেন-পেনের কাজ করেন।

বাড়িতে কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর গোবর্ধনবাবু নিজে বাহির হইয়া

আসিলেন এবং সাদরে বৈঠকখানায় লইয়া বসাইলেন। বয়সে প্রৌঢ়, শীর্ণকায় বাঙালীর স্বাস্থ্যহীন চেহারা। ঘরে তক্তাপোশ পাতা, একপাশে আলমারিতে প্রচুর বই, অন্যদিকে জানালার ধারে একখানি টেবিল পাতা, তাহাতে কাগজপত্র অতি পরিপাটিভাবে সজ্জিত রহিয়াছে।

গোবর্ধনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হইবার পর তাঁহাকে আমার আসিবার উদ্দেশ্য বলিলাম। তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এই যে দেখুন না, এমন একটা দাঙ্গা হয়ে গেল। কিছুই হ'ত না, যদি হিন্দু ও মুসলমান ঠিক ঠিক নিজেদের ইতিহাস জানত।"

আমি আশ্চর্য হইয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ক্রমে সবিস্তারে যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই—পূর্বে বেদই ছিল, এবং বেদ হইতে জগতের যত ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। বেদে সূর্যের পূজা আছে এবং তাহাই পরবর্তীকালে জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হউক আর পেরু, মেক্সিকো, চীন দেশই হউক, সর্বত্র ধর্মের মূলে ঐ বৈদিক সূর্যোপাসনার অস্তিত্ব দেখা যায়। ক্রীশ্চানদের ধর্ম এবং আরবের ইসলামধর্ম মূলতঃ বেদ হইতে রূপান্তরিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

গোবর্ধনবাবু বি. এ. পাস করেন নাই। কিন্তু ইংরেজীতে তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি ক্রমে উত্তেজিত হইয়া নানাবিধ প্রমাণ সহকারে সর্বধর্মের ঐতিহাসিক একত্বের ব্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "এই বিষয়টা যদি লোকে বুঝত যে, সব হিন্দু ও মুসলমান শেষ পর্যন্ত এক, একই ধর্মের দুটো সম্প্রদায়ের মত, তাহলে আজকে দেখতেন কাশীতে আর পুলিশের দরকার হ'ত না! কতদিন থেকে মশাই, বলছি যে এ বিষয়ে প্যাম্‌ফ্লেট ছাপিয়ে বিলি করা উচিত, কিন্তু কে বা করে! আমাকে তো সবাই পাগল ভাবে, আর আমারই বা ক্ষমতা কতটুকু?"

সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলাম, যথার্থই লোকে কলহ-বিবাদ

অজ্ঞানতার বশেই করে। জ্ঞান পরিপূর্ণ হইলে কেন মারামারি করিবে ? কিন্তু কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চানের এত বড় একত্বের সংবাদ সংগ্রহ করিলেন তাহা জানিবার বাসনা হইল। মুখ ফুটিয়া কথাটা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম। তিনি সোৎসাহে পুরাতন খাতাপত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন যে বেদের ওঁ-কারই পরে ত্রিশূলে পরিণত হইয়াছে। অতএব বেদান্ত এবং শৈবধর্ম মূলতঃ অভিন্ন। কেমন করিয়া তাহা হইল তাহা খাতায় বেশ গুছাইয়া লেখা রহিয়াছে। হিন্দীতে ওঁ-কারকে যেভাবে লেখা হয়, তাহাকে প্রথমে কাত করিয়া শোয়াইয়া ডান দিকের ডাঁটিটি সিধা করিয়া দিলে এবং উপরের আঁকশি-গুলি টানিয়া সোজা করিলেই নির্দোষ ত্রিশূলে পরিণত হয়।

এই তো গেল শৈবধর্মের কথা। তাহার পর ক্রীশ্চান ধর্ম। মালাবার উপকূলে একটি প্রাচীন গির্জা আছে। যীশুখ্রীষ্ট যখন দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন বাইবেলে লেখা আছে, তাঁহার শরীরের উপর আকাশ হইতে একটি শ্বেত পারাবত অবতরণ করিয়াছিল। মালাবারের প্রাচীন গির্জাটিতে তাহারই এক চিত্র অঙ্কিত আছে। সেই চিত্র হইতে গোবর্ধন লাহা মহাশয় নিঃসন্দেহে সহজেই প্রমাণ করিয়াছেন যে সূর্য ও শিব উপাসনার প্রতীকও যেরূপ, ক্রীশ্চানদেরও সেইরূপ। অতএব উভয় ধর্মই এক।

কিন্তু গোল বাধিয়াছে ইসলামকে লইয়া। ইসলামে অমন সোজাসুজি প্রমাণ তিনি কিছু এযাবৎ পান নাই। খানিক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে লোককে ঠিক বিশ্বাস করানো যাইতেছে না। তবে লাহা মহাশয়ের ধারণা তিনি ঠিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন, লাগিয়া থাকিতে পারিলে প্রমাণের অভাব হইবে না। ইসলামের চন্দ্রকলাকে লাহা মহাশয় শিবের জটাজূট হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া চন্দ্রকলা বলিয়া মনে করেন।

মুসলমানগণ মূর্তিপূজার বিরোধী বলিয়া শুধু চাঁদটুকু রাখিয়া নীচের মাথা হইতে শিবের ধড় পর্যন্ত আগাগোড়াই বাদ দিয়াছে। এ প্রমাণ কিন্তু গোবর্ধনবাবুর বন্ধুবান্ধবেরা স্বীকার করেন না। গোবর্ধনবাবু কিছু দিন হইতে তাই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—ইহার কিছু একটা বিহিত করা যায় কিনা! শেষে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, শিবলিঙ্গের গড়নে এবং কাশীর বিভিন্ন মসজিদের মিনারের মধ্যে একটি আশ্চর্য অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। শুধু তাই নয়, প্রাচীন মিশরের স্তম্ভ ক্লেওপেট্রাস নিড্‌লের সহিতও নাকি আকারগত সৌসাদৃশ্য বর্তমান। ইহার ভিতরের তত্ত্বটি তিনি এখন খুঁজিয়া বাহির করিতে চান।

দীর্ঘক্ষণ আলোচনার ফলে বেলা তখন অনেক হইয়া গিয়াছিল। আমরা সকালে আলোচনা আরম্ভ করিবার অল্পক্ষণ পরে একটি শীর্ণকায় কালো মেয়ে আসিয়া গোবর্ধনবাবুর সম্মুখে একবাটি দুধ এবং আমার জন্য একটি রেকাবিতে ঘরের তৈয়ারী বরবটির ঘুগ্‌নি খাইতে দিয়া গিয়াছিল। সেই মেয়েটি এখন ততোধিক শীর্ণ শ্লথচর্ম রোগগ্রস্ত একটি শিশুকে কোলে লইয়া আসিয়া জানাইল যে, মা বলিতেছেন, স্নান করিয়া খাইবার বেলা অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। আমিও উঠি উঠি করিতে লাগিলাম, কিন্তু গোবর্ধনবাবুর তখন রোখ চাপিয়া গিয়াছে। তিনি আরব দেশের এক প্রাচীন সচিত্র ভ্রমণকাহিনী বাহির করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেন, ইসলামের পূর্বে যে ধর্ম আরবে প্রচলিত ছিল তাহার সহিত পরবর্তী ইসলামের সম্বন্ধ কি? আমি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম, বিশেষ করিয়া যখন দরজার আড়াল হইতে ঘন ঘন চাবির গোছার আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল। গোবর্ধনবাবু সহসা একবার ভিতরের দিকে চাহিয়া উঠিয়া গেলেন এবং মুহূর্তমধ্যে ফিরিয়া

আসিয়া কহিলেন, "ইস্, আপনার যে একেবারে ভয়ানক দেরি করিয়ে দিয়েছি। এইখানেই তাহলে দুমুঠো খেয়ে যান না!"

আমি তখন পলাইবার জন্য ব্যস্ত। থাকিলে আহারান্তে এই গবেষণার পুনরাভিনয় হইবে এই আশঙ্কায় কোন রকমে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। হোটেলে ফিরিয়া দেখি, ঘরে ঢাকা দেওয়া ভাত ঠাণ্ডা কড়কড়ে হইয়া গিয়াছে, এক গ্লাস জল খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া এই বিচিত্র গবেষণা এবং ইহার দ্বারা হিন্দু মুসলমান সমস্যার ততোধিক বিচিত্র সমাধানের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আর তাহার সহিত কেবলই ডন্ কুইক্সোটের কাহিনী মনে পড়িতে লাগিল।

রাজপুত্র

ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম, রাজপুত্র ঘোড়ায় চাপিয়া মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বনে বনে মেঘবরণ চুল ও কুঁচবরণ রাজকন্যার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তখন রাজপুত্রের একটা দিগ্বিজয়ী সুন্দর মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবজীবনে যখন রাজপুত্রের সঙ্গে সত্যই সাক্ষাৎ হইল, তখন আর তাহার সঙ্গে ছেলেবেলার সেই ছবির কিছুই মিলিল না। যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহার কথা বলিতেছি।

একবার পুরাতন মন্দিরের সন্ধানে উড়িষ্যায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। বাহনের মধ্যে এক পুরাতন সাইক্ল ছিল, এবং আমার পিঠের উপরে যাবাবরের যাবতীয় সম্পত্তির একটি বোঝা ঝুলিতেছিল। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে কত যে ছোট ছোট রাজ্য আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদেরই একটির মধ্য দিয়া সেদিন সকালবেলায় যাইতে যাইতে পথের ধারে একটি পুরাতন আমবাগানের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমের বাগানে কয়েকজন লোককে দেখা গেল, তাহারা হাতে বন্দুক লইয়া উপরের দিকে মুখ করিয়া ঘোরাফেরা করিতেছিল, এবং নিকটে একটি ছোট মোটরকার দাঁড়াইয়া ছিল। আমি বাগান ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পিছন হইতে দুই তিন জন চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, হয়তো আমার পিঠের বোঝা এবং অপরূপ বেশভূষা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে।

সাইক্ল হইতে নামিতে বন্দুক-হাতে একজন দীর্ঘকায়, তাম্রবর্ণ প্রৌঢ়

ব্যক্তি নিকটে আসিলেন। ইনিই রাজপুত্র! কপালে বড় একটি রক্ত-বর্ণের তিলক, গায়ে সিল্কের মিহি পাঞ্জাবি। পরণে খুব মিহি কাপড়, অতিশয় মিহি করিয়া কোঁচানো, পায়ে লাল রঙের সৌখিন নাগরা জুতা। সকালে স্নান করিয়াছেন এবং গায়ে প্রচুর গন্ধদ্রব্য মাখিয়াছেন। নিকটে আসিতে টের পাইলাম, সেই গন্ধের সহিত হুইস্কির তীব্র গন্ধও মিশিয়া আসিতেছে। রাজপুত্র ভদ্রভাবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় দিলাম যে, আমার পেশা ঘুরিয়া বেড়ানো, এবং উপস্থিত এই রাজ্যে একটি ভাঙা পুরান মন্দিরের সন্ধানে আসিয়াছি। রাজপুত্র উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তবে তো আপনি আমাদের অতিথি। আসুন, আমার গাড়িতে আপনাকে পৌঁছাইয়া দিই, আপনার বাইসিক্ল লইয়া আমার চাকর পিছনে পিছনে আসুক।"

যাইতে হইবে প্রায় এগারো মাইল পথ। মোটরে উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। সাইক্লে চলায় অবশ্য কষ্ট আছে, এবং মোটরে আরামে যাওয়া যাইবে। কিন্তু সাইক্লের সে স্বাধীনতা কোথায় পাইব? সেইজন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ভদ্রভাবে চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। মোটর চলিতে লাগিল। পথ খুব ভাল নয়, মোটরের বেগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মোটর-চালনায় রাজপুত্রের হাত দেখিলাম খুব পাকা বটে। গাড়ি চালাইতে চালাইতে তিনি ক্রমে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। প্রথমে উড়িয়া ভাষায়, তাহার পর মাঝে মাঝে ইংরেজীতে কথা চলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমি অতি সামান্য লোক। Poorest of the poor in the British Empire of His Majesty George VI. আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এই অঞ্চলের রাজা। আমার পিতা আমার জন্য মাত্র ছয় লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমি সবই খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি

নিতান্তই গরীব। যখন পয়সা ছিল তখন পুনা, উটকামণ্ড, শিলং, মাদ্রাজ, সর্বত্র গিয়াছি এবং বিস্তর খরচও করিয়াছি, কিন্তু এখন আর পারি না। এখন শিকার করিয়া বেড়াই। সকালে পূজা সারিয়া বসিয়া ছিলাম। খেয়াল হইল, তাই রাইফ্ল লইয়াই পাখী শিকার করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তা' ভালই হইল, একজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দিনটা কাটিবে ভাল।"

আমি আর কি বলিব, বসিয়া বসিয়া হুঁ হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। রাজপুত্র বলিলেন, "আমরা মূর্খ, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া কত সুখী হই। ইংরেজী দুইটা কথাও ঠিকমত বলিতে পারি না। তবে একটু বাঙলা জানি। কলিকাতায় হরি ঘোষ স্ট্রীটে তিন মাস বাড়ি ভাড়া করিয়া ছিলাম।" আমাদের সম্মুখে সেই সময়ে একটি গরুর গাড়ি দেখা গেল। আমি লক্ষ্য করিলাম, রাজপুত্রের রথ ঊর্ধ্বশ্বাসে শকটের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে। হাঁ হাঁ করিতে করিতে রাজপুত্র আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত মোটর পাশ কাটাইয়া লইলেন, এবং পার হইয়া শকটের চালককে কঠিন ইংরেজী ভাষায় কয়েকটা চোখা চোখা গালিবর্ষণ করিলেন।

কিন্তু সেই ইংরেজী ভাষাই কাল হইল, তাহার তোড় আর থামিতে চাহিল না। রাজপুত্র সেই সময়ে খুব জোরে মোটর চালাইতেছিলেন এবং একটা ভাঙা ইংরেজী সুর শিস দিয়া গাহিতেছিলেন। সুরটি সাঙ্গ হইলে তিনি আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। তাহার দৃষ্টি কিন্তু ঠিক রাস্তার উপরে নিবদ্ধ ছিল। দুই পাশে ছোট ছোট পাহাড়, বাঁশের ঝাড়, শালের বন, মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত হু হু শব্দে কানের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। ধানের ক্ষেতে এক আধ জন চাষী মন্থরগতিতে লাঙল দিতেছিল। কোথাও বা রাখাল বালকেরা ঢিল অথবা হাতের

পাচন-বাড়ি ছুঁড়িয়া বনের ফল পাড়িতেছিল। রাজপুত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

Oft I have heard of Lucy Gray
And, when I cross'd the wild,
I chanced to see at break of day
The solitary child.
No mate, no comrade Lucy knew ;
She dwelt on a wide moor,—
The sweetest thing that ever grew
Beside a human door !

শেষের পদটি তিনি চার পাঁচ বার গভীর ভাবব্যঞ্জনার সহিত আবৃত্তি করিলেন। আমিও ভাবিতে লাগিলাম, হায় রে, কোথায় এই অরণ্য-প্রদেশ মোটরকারে ছুটিয়া চলিয়াছি, আর কবে কোন্ দেশে বেচারী লুসি গ্রে ঝড়ের মধ্যে পথ হারাইয়া নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। তাহার জন্য মমতা হইল, সে বেচারীকে লইয়া আজ অকালে আর টানাটানি কেন ?

লুসি গ্রের পালা সাঙ্গ হইলে রাজপুত্র একখানি বাঙলা গান ধরিলেন। উচ্চারণ প্রায় নির্দোষ, সুরেও বিশেষ ভুল নাই। তিনি গাহিলেন—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর মলিন বেশ॥"

গাহিয়া ইংরেজীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি মূর্খ, বুনো দেশের লোক, বাঙলাটা কি ঠিক হইল ?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার বাঙলার তারিফ করিলাম। এইরূপ

সময়ে প্রধান পথের ডান দিকে একটি ক্ষুদ্রকায় পথ দেখা গেল। আমরা সেই পথ ধরিয়া অনতিদূরে মন্দিরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম।

মন্দিরে পৌঁছিতে পুরোহিত, রাজকর্মচারী ও বাগানের অনেকগুলি মালী ছুটিয়া আসিল এবং রাজপুত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া আমাকে বাগানে লইয়া গেলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি শালকাঠের পাটার উপরে ইংরেজী অক্ষরে ফরাসী ভাষায় লেখা রহিয়াছে, Jardin de luxe অর্থাৎ সখের বাগান। এই অরণ্য-প্রদেশে আচম্বিতে ফরাসী ভাষার নমুনা দেখিব, এমন কল্পনাও করি নাই। কিন্তু সৌখিন রাজপুত্রের দেশে সবই সম্ভব। রাজপুত্রের বাগানে একদিকে সুন্দর ফুলের এবং পাতাবাহার গাছের শ্রেণী। অপর দিকে কিছু নীচে একটি স্বল্পতোয়া নদীর নিকটে শাক-সবজি বাগান। শাকের ক্ষেতে পৌঁছিলে কয়েকজন পার্বত্য রমণী আসিয়া রাজপুত্রকে দণ্ডবৎ করিল। তিনি তাহাদিগকে আদেশ দিলেন, "ঘরে অতিথি আসিয়াছেন, ভাল তরকারি তুলিয়া দাও।" কোথাও কুমড়ার ডাঁটা, কোথাও বা মোচা ধরিয়াছিল। এটা কাট, ওটা কাট—করিতে করিতে ক্ষণেকের মধ্যে পুরা দুই ঝুড়ি আনাজ কাটা হইয়া গেল। তখন রাজপুত্র বলিলেন, "আপনার জন্য তো মাছ চাই। চলুন এখান হইতে দুই মাইল দূরে নদীর দহে আমরা রাইফ্লের সাহায্যে বড় বড় রুইমাছ শিকার করিয়া আনি।" বেলা বাড়িতেছিল দেখিয়া আমার আর যাইবার উৎসাহ ছিল না। তাহার উপর আবার মন্দির দর্শনের পর দীর্ঘপথ সাইক্লে অতিক্রম করিয়া সেইদিনই আমাকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে পৌঁছিতে হইবে। এই সকল আপত্তি তুলিয়া শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের অনুরোধ এড়াইয়া গেলাম।

একজন সুদর্শন যুবতী নারী বাগানের শাকপাতা লইয়া আমাদের

পিছন পিছন আসিতেছিল। রাজপুত্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটিকে তো আগে দেখি নাই, ইহার দেশ কোথায়, কবে এখানে আসিল?" জার্দ্যা ছ লুক্সের কর্মচারী সংবাদ দিল যে, ইহার বাড়ি নিকটবর্তী কোন গ্রামে বটে, তবে শ্বশুরবাড়ি পার্শ্ববর্তী করদ রাজ্যে অবস্থিত। ইহার স্বামী সম্প্রতি সেই রাজ্যের এক রমণীকে বিবাহ করিয়াছে এবং ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। রমণীটির জন্য রাজপুত্রের অন্তরে কেমন মমতার উদ্রেক হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুই কেন অন্য রাজ্যে বিবাহ করিলি? এই রাজ্যেই বিবাহ করিলে এখনই তোর স্বামীকে আমি ধরিয়া আনিতাম এবং চাবুক মারিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, কেন সে তোর এই দশা করিল, কেন সে তোকে ছাড়িয়া গিয়াছে?" মেয়েটি আনতনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার জনৈক সঙ্গিনী উত্তর দিল, "কি করিবে হুজুর, উহার কপালে দুঃখ লেখা রহিয়াছে, কেহ কি খণ্ডাইতে পারে?" কথাবার্তার ভাবে মনে হইল, রাজপুত্রকে সকলে ভয় করে, ভক্তিও করে। সাধারণ প্রজাতেও বেশ সহজভাবে তাঁহার সহিত কথা বলিতে ভয় পায় না। রাজপুত্র আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আমি ইহাদের সহিত খুব মেলামেশা করি। দরকার হইলে চাবুকও মারি, আবার পকেটে টাকা-পয়সা থাকিলে নির্বিচারে সকলকে দিই। তাই ইহারা আমাকে খাতির করে। আমার মটো হইল—Do or die, do or die!"

বলিয়াই তিনি একজন মালীকে আমার জন্য প্রচুর তরকারি আলাদা করিয়া রাখিতে বলিলেন, এবং অবশিষ্ট তরকারি রাজবাড়ির জন্য গাড়ির পিছনে বোঝাই করিয়া দিতে বলিলেন। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে অধিকাংশ তরকারি শেষ পর্যন্ত গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। আমি

বলিলাম, "আপনি এগুলি সব লইয়া যান, আমার সামান্য যাহা প্রয়োজন, তাহা না হয় আবার তুলিয়া লইব।"

তরকারি বোঝাই করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রাজপুত্র মালীদের খেলাচ্ছলে শাসন বরিয়া বলিতে লাগিলেন, "Quick quick! Do or die, do or die." তাহারাও মরি-বাঁচি করিয়া শাক-সবজিতে পিছনের গদি বোঝাই করিয়া ফেলিল। তখন রাজপুত্র রাইফ্লে গুলি ভরিয়া নদীর দহে পাকা রুইমাছ হত্যা করিবার জন্য পুনরায় তীরবেগে মোটর ছুটাইয়া দিলেন।

সাহিত্যসভা

মধ্যভারতের এক ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের ঘটনা। ছোট্ট শহর, গ্রাম বলিলেও চলে, ইহাই সেই রাজ্যের রাজধানী। ছোট হইলেও অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নাই। স্কুল, মিউজিয়ম, নাট্যশালা, সর্ববিধ প্রতিষ্ঠানই রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

শীতকালের সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। একটি সরু গলির ভিতর দিয়া একটি বালক চরাইবার জন্য একপাল ছাগল লইয়া যাইতেছিল। ছাগলগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বড় বড় কানওয়ালা। দুইটি ছাগল পথের ধারে দেওয়ালে আটকানো একখণ্ড কাগজ খাইবার জন্য দেওয়ালের গায়ে সামনের পা তুলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া আমার বেশ মজা লাগিল। কথায় বলে, ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয়। কাগজের উপরেও ইহাদের আসক্তি। ছাগলের পাল চলিয়া গেলে কাগজখানি ভাল করিয়া দেখিলাম। তাহার নিম্নাংশ ছাগদন্তের আঘাতে কিঞ্চিৎ জখম হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্পষ্ট দেবনাগরী অক্ষরে পড়া যাইতেছিল যে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় দুর্গামেলার মাঠে সাহিত্যের বৈঠক বসিবে, অতএব সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। অল্পদিন হইল সেখানে আসিয়াছিলাম, তাই শহরের সব ঠিকানা জানা ছিল না। সদর বাজারে এক গাঁজার দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু হে, তোমাদের দুর্গামেলা কোথায়?" সে ব্যক্তি পথ বুঝাইয়া দিল।

বিকালে বেড়াইবার সময়ে একস্থানে দেখিলাম, বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়া ফুটবল ম্যাচ দেখিতেছে। ম্যাচে অনুরাগ ছিল না, তাই ভিড়ের

লোকজনকে দেখিতে লাগিলাম। সকলেরই খুব উৎসাহ। বেশি উৎসাহ দেখা গেল হাফ-টাইমের সময়। তখন খেলোয়াড়গণ ও ভক্তবৃন্দ মিলিয়া বোতলের পর বোতল সোডা-লেমনেড পান করিতে লাগিল স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ লেমনেড-বিক্রেতা সরস হিন্দীতে ছড়া কাটিতেছিল, এবং স্কুলের শিশুর পাল অবাক হইয়া শুনিতেছিল অথবা চীনাবাদামের ঠোঙা হাতে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে ফুটবল-খেলোয়াড়গণ অবলীলাক্রমে যে ভাবে লাল রঙের লেমনেড পান করিতেছিলেন, তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ দুর্গামেলায় বিশাল কয়েকখণ্ড শতরঞ্জির উপর সাহিত্যা-মোদীগণ সমবেত হইলেন। পণ্ডিত, পুরোহিত, ডাক্তার, বৈদ্য সকলেই আসিলেন। স্কুলের ছাত্রেরাও আসিল, আর আসিল সেই লেমনেড-বিক্রেতা এবং তৎসহ প্রাতঃকালে আমার পথপ্রদর্শক গাঁজার দোকানদারটি। সভায় তর্ক হইবে। সাহিত্যে স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করা উচিত না অনুচিত, ইহাই আলোচনার বিষয়। সভার অধিপতি ছিলেন রাজার খুল্লতাত, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার জন্য লাল সিল্ক দিয়া মোড়া ড্রয়িং রুমের সেটি আনা হইয়াছিল। তিনি লম্বা কৌচটির উপরে বসিয়া ছিলেন, পাশে দুইখানা গদিওয়ালা চেয়ার খালি পড়িয়াছিল, কেহ তাহাতে বসিতে ভরসা করে নাই। সভাসদ্‌গণ শতরঞ্জির উপরে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা চলিতে লাগিল। সাহিত্যিক ভাষা এবং কথ্য ভাষার মধ্যে কোন্‌টিকে বেশি অবলম্বন করা উচিত, সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য কি এই সকল গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা চলিল। অধিকাংশ বক্তৃতাই সারহীন, মাৎসর্বস্ব। কিন্তু দুই একজন বক্তা কথ্য ভাষার পক্ষে এবং সংস্কৃতবহুল ভাষার বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলিয়া বেশ জমাইয়া তুলিলেন। রাজবাড়ির কুলপুরোহিত সভাপতির মনোরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কখনও

হিন্দী, কখনও সংস্কৃতে ছড়া কাটিয়া বেশ কৌতুকের অবতারণা করিলেন। তথাপি রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, ততই শ্রোতার দলও ক্ষীণ হইতে লাগিল। অনেকগুলি বক্তৃতা শুনিয়া আমার কেবল অভিমন্যুর কথা মনে হইতেছিল। অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিতে শিখিয়াছিলেন, বাহির হইবার কৌশল শেখেন নাই। বক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই বক্তৃতা আরম্ভ করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু থামাইতে শেখেন নাই। ফলতঃ হাই তুলিয়া তুড়ি মারিতে মারিতে শতরঞ্জির প্রান্তবর্তী সভ্যগণ সভাপতিকে একটু আড়াল করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা মাঝখানে ছিলেন, তাঁহারা আবার ছড়াইয়া প্রান্তদেশ দখল করিতেছিলেন। উদ্দেশ্য, সুবিধা পাইলে তাঁহারাও সরিয়া পড়িবেন। এইরূপে রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে পূর্বের জনাকীর্ণ শতরঞ্জির মধ্যভাগে আর জনমানব রহিল না। কেবল চতুঃপ্রান্তে কিছু লোক চুপচাপ বসিয়া রহিল। একমাথা ঘন চুলের ঠিক সভাপতির মধ্যভাগেই যেন বৃহৎ টাক পড়িয়া গিয়াছে।

সভাপতি বোধ হয় অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাত্রি দশটার সময়ে সভার মতিগণনার আদেশ দিলেন। আমি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম কে কোন্ পক্ষে ভোট দেয়। সাহিত্যিক ভাষার পক্ষে হাত এক রকম উঠিল না বলিলেই চলে। দুই চারিজন স্কুলের অর্বাচীন বালক সে পক্ষে হাত তুলিয়াছিল, এবং তাহারও কারণ ছিল। রাজবাড়ির একটি বালক সাহিত্যিক ভাষার পক্ষে বক্তৃতা দিয়াছিল, ইহারা সেই বালকের সহপাঠী। যখন অপর পক্ষে, অর্থাৎ চলিত ভাষার পক্ষে মতিগণনার আদেশ হইল, দেখিলাম শতরঞ্জির চতুঃপ্রান্ত হইতে বহু হাত তাহার সমর্থনে খাড়া হইয়া উঠিল। আর, সকলের চেয়ে উৎসাহ সেই বৃদ্ধ রাজপুরোহিতেরই বেশি। আমার সম্মুখে ফুটবল মাঠের লেমনেডওয়ালা এবং গঞ্জিকাবিক্রেতা উভয়েই

উপবিষ্ট ছিল। তাহারাও দেখিলাম সোৎসাহে হাত তুলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তিনি বলিলে তবে হাত নামাইবে।

মনে ভাবিলাম, হাঁ, সাহিত্যের উপযুক্ত বিচারক বটে! এবং এই ভোটের দ্বারাই হিন্দী সাহিত্যের একটি উপশাখার হয়তো ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ হইবে। এরূপ সভার নোটিস ছাগলে খাইবে না তো কে খাইবে?

স্বর্গের সংবাদ

পিতামহ ব্রহ্মার বয়স হইয়াছে। তিনি আর সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, তাঁহার মেজাজ কিঞ্চিৎ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, ঘুমের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গতরাত্রে উত্তাপের আতিশয্যে প্রথমে তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই। কিন্তু রাত্রির শেষভাগে মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হইলে তিনি এক প্রাচীন চন্দনবৃক্ষে হেলান দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার চতুর্দিকেই মস্তক, সেইজন্য স্বর্গের সীবনশিল্প-বিভাগ তাঁহার যোগ্য উপাধান নির্মাণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। সেই হইতে লোকপিতামহ বিরিঞ্চিদেব বরাবর উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রাগ্রহণের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দেবাদিদেবের এক মুহূর্তে অন্যান্য দেবগণের কল্পান্ত পরিমিত সময় অতিবাহিত হয়। প্রাতঃকালে তাঁহার জাগরণের বিলম্ব হইতে লাগিল, ইতিমধ্যে ইন্দ্রাদিদেবগণের শতবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। পিতামহ যাহাকে যে কাজ দিয়াছিলেন, সকলেই সে বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এমন কি সুযোগ বুঝিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যলোকের "সমুদ্র-কূলে কিং ক্যানিউট" নামক একখণ্ড প্রহসনের মহলা দিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে মর্ত্যলোকে নানাবিধ উপদ্রবের সূচনা হইতে লাগিল। লোকে খাইতে পায় না, পেটে বিদ্যা নাই, সকলে ভূমি হইতে শস্য উৎপাদনে রত না হইয়া কি উপায়ে ছলে বলে বা কৌশলে অপরের

উৎপাদিত শস্য দখল করিতে পারে, তাহারই জন্য উন্মত্তবৎ চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহাদের অন্ন মারা যাইতে লাগিল, তাহারা ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র চীৎকার আরম্ভ করিল। কেহ কেহ মুহুর্মুহুঃ "ইনকিলাব" নামক যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিল, কেহ পরস্পরের "জয়" উচ্চারণ করিতে লাগিল! মর্ত্যলোকের অধিবাসিগণ ক্রমে দেবগণের সিতি ব্যঙ্গ, কটূক্তি এবং অবশেষে রুশ-নামক ক্ষেত্রে ষোড়শোপচারে দেবমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইল। এই সকল আন্দোলন এবং চীৎকারের ফলে লোকপিতামহের সুনিদ্রার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত সাধিত হইল। ইন্দ্র, সরস্বতী, উর্বশী, মেনকা প্রভৃতি সকলে নিরীক্ষণ করিলেন যে শেষনাগের মস্তকে অবস্থিত মেদিনী যেমন ক্ষণে ক্ষণে প্রকম্পিত হইয়া থাকে, ভগবান কমলযোনির মস্তকচতুষ্টয়ও সেইরূপ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আচম্বিতে মর্ত্যলোক হইতে অতিমাত্রায় কোলাহলের শব্দ উত্থিত হইল। ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ অলিন্দের প্রান্তে আসিয়া মনোযোগ সহকারে নিম্নভূমিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন মশকসদৃশ কতকগুলি ব্যোমযান ভূমণ্ডলের উপর দিয়া ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং তাহাদের ঠিক পশ্চাদ্ভাগে ক্ষণে ক্ষণে অগ্ন্যুৎপাত ও নানাবিধ আকস্মিক শব্দ উত্থিত হইতেছে। দেবগণের বড় মজা লাগিল। কিন্তু তাহাদের আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ক্ষণকালের মধ্যে মর্ত্যে "জয় জয়" শব্দের পরিবর্তে "গ্যাস গ্যাস" বলিয়া বিকট এক আর্তনাদ উত্থিত হইল, এবং অন্তরীক্ষপ্রদেশে পর্যন্ত একটি উগ্র কটু গন্ধ ভাসিয়া আসিল। মর্ত্যলোকে ভূতাপসারণ মন্ত্রের সঙ্গে যে সরিষার বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেইরূপ একটি গন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাড়াতাড়ি মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া নাকে চাপিয়া দৌড়াইতে

লাগিলেন। তাঁহারা দৌবারিককে আদেশ দিলেন, "ঝটিতি দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দাও, মর্ত্যলোক হইতে বড় দুর্গন্ধ আসিতেছে।"

কিন্তু দুর্গন্ধ তখন আসিয়া পড়িয়াছে, লোকপিতামহ দুইচারিবার সবেগে ক্ষুৎকার করতঃ জাগিয়া উঠিলেন। সম্মুখে ইন্দ্রাদি দেবগণের নাসিকা উষ্ণীষপ্রান্তের দ্বারা আচ্ছাদিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস্যগণ, তোমরা এইভাবে রহিয়াছ কেন? নাসিকায় কি কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে? আর মর্ত্যলোকে এত কোলাহলই বা কিসের জন্য উত্থিত হইতেছে?"

সত্যভয়ভীত দেবরাজ তখন পিতামহকে যথারীতি অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, "প্রভো, মর্ত্যে বড়ই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মর্ত্যলোকের একটি নাটকাভিনয়ে ব্যস্ত ছিলাম, ইতিমধ্যে সেখানে যে দুর্যোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা সংবরণ করা আর আমাদের সাধ্যের আয়ত্ত নহে।"

কমলযোনি ভ্রূ-অষ্টক যুগপৎ কুঞ্চিত করিয়া ইন্দ্র, বরুণ এবং পূষাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের যে সকল কাজের ভার দিয়াছিলাম তাহা ঠিকমত করিয়াছ কি? ইন্দ্র, বর্ষণাদি তো যথারীতি হইতেছে? পূষন্, জীবগণের কৃষিকর্মে কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই তো? সকল সংবাদ নিঃসঙ্কোচে বিস্তৃতভাবে আমার নিকট বিবৃত কর।" দেবরাজ নিরুত্তর রহিলেন; কেন না "কিং ক্যানিউট" নামক নাটকাভিনয়ে তাঁহারই সর্বাপেক্ষা উৎসাহ ছিল এবং তিনিই সর্বপ্রথমে কর্মে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূষা বলিলেন, "পিতামহ আমার দোষ নাই। ইন্দ্র ঠিকমত বর্ষণ করিতেছেন না, কখনও বেশি, কখনও কম বৃষ্টি হইতেছে। বিশ্বকর্মা কিছুকাল হইতে মারণাস্ত্র নির্মাণেই সমধিক আসক্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং জাপান নামক দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনি মারণাস্ত্রের সুবৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। মর্ত্যের

জীবগণও কূপ-তড়াগ-বাপী আদি খনন না করিয়া ঐ সকল নরক-সদৃশ কর্মশালায় সমধিক সংখ্যায় নিয়োজিত রহিয়াছে। যথারীতি সেচের ব্যবস্থা হইতেছে না, চতুর্দিকে শস্যহানি ঘটিতেছে। আমি কি করিব? সকলই আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।"

তখন ভগবান বিরিঞ্চিদেব দেবী সরস্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "অয়ি দীপ্তিময়ী! তুমি কি করিতেছিলে? আমি তো দেখিতেছি মানবে জ্ঞানহীন হইয়াই এইরূপ দুর্দশাপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে। তোমারই বা কর্মের ত্রুটি কেন? মর্ত্যে ব্রাহ্মণগণ যথারীতি বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতেছেন তো?"

দেবী বলিলেন, "ভগবন্, আমার প্রতি কাহারও আর তেমন ভক্তি নাই। আমার পূজায় নগরে নগরে বহু মূর্তি নির্মিত হয় বটে, কিন্তু ভক্তিভরে আর কেহ আমায় আহ্বান করে না। তাহারা আমার মূর্তি গড়িতে মেনকা এবং রম্ভার আকৃতি গড়িয়া বসে, এবং পূজা না করিয়া রাজপথে আমার মূর্তির সম্মুখে উন্মত্তবৎ ব্রতচারী নামক একপ্রকার নৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

"আর ব্রাহ্মণগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাহারা তো আর নাই। সকলে উপস্থিত হোমশালা পরিত্যাগ করিয়া রন্ধনশালাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র বৈশ্যগণ বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের গতিও বিচিত্র। কেহই প্রকৃত জ্ঞানের আদর করে না, কেবল অর্থ চায়। মূলগ্রন্থ কেহ পাঠ করে না। ভাষ্যের পর ভাষ্য রচনা করিয়া গুরু শিষ্যকে পড়াইয়া থাকে। বিশ্বকর্মাই তো সকল অনর্থের মূল। মুদ্রাযন্ত্র নামক এক পদার্থের সাহায্যে ধূলিরাশির মত নোটবুকের মেঘে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং অধ্যাপকগণ সেই ধূলিবিকিরণে সহায়তা করিয়া অর্থোপার্জন করিতেছে। সেই অর্থ

তাহারা ভূমিক্রয় অথবা গৃহাদি নির্মাণ করিতেছে। কেহ বা কুশীদজীবী হইয়াছে, নতুবা চিনির কল স্থাপন করিতেছে।

"পিতামহ, আমার দ্বারা কিছু হইবার নহে। আপনি কোনও বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করুন, যিনি অন্ততঃ আমার মন্দিরকে বৈশ্যকুলমুক্ত করিতে পারিবেন।"

পিতামহ বলিলেন, "নারীজাতি স্বতঃই প্রগল্‌ভা। তোমাকে এত কথা কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? যাহাই হউক, তোমরা উপস্থিত প্রস্থান কর, আমি ইহার উপায় চিন্তা করিতেছি।"

সকলে সারা দিবস নানা দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন, কি জানি দেবাদিদেবের কীদৃশ আদেশ হয়। কিং ক্যানিউটের রিহার্সাল করিতে সেদিন আর কাহারও ভরসা হইল না।

সন্ধ্যা অতিক্রম হইলে ব্রহ্মা দেবগণের এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের অবহেলা দর্শন করিয়া আমি সাতিশয় লজ্জিত হইয়াছি। মর্ত্যে দুঃখের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছে, অথচ তাহা নিরাকরণের প্রয়োজনও আছে। বিশ্বকর্মা বিদ্রোহী হইয়াছেন, মানবের কল্যাণের চিন্তা না করিয়া তিনি কেবল হননের অস্ত্র নির্মাণে নিরত রহিয়াছেন। মর্ত্যেও দেখিতেছি জ্ঞান ও কর্ম লুপ্ত হইয়াছে। সকলেই কিছু গুছাইয়া লইবার জন্য বুদ্ধির ব্যবহার বা কর্মের ভান করিতেছে। দ্বিপ্রহরে আমি গুপ্তদূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ লইয়াছি। শুনিলাম, দুই-চারিজন দেবতুল্য কিন্তু সাতিশয় মূর্খ ব্যক্তি মানবের কল্যাণের নিমিত্ত কংগ্রেস অথবা সোশালিজ্‌ম নামক এক প্রকার ধর্মের প্রবর্তন করিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু তাহারা যে কোন্ দেবতার পূজা করিতেছে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলাম না। শুনিতেছি, হিষ্ট্রি নাম্নী নবাগতা যবনী কোনও দেবী তাহাদের আরাধ্যা। দূতগণ

সম্যক্‌ভাবে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। তবে আভাসে বুঝিয়াছি যে, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে নিঃস্বার্থও বটে।

"এই ব্যক্তিগণকে যদি সম্যক্‌ জ্ঞান এবং সম্যক্‌ কর্মপদ্ধতি দেওয়া যায়, তাহা হইলে মানবের কিছু কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অতএব হে পূষন্‌, হে ইন্দ্র, হে সরস্বতী, তোমরা এক্ষণে স্বর্গধাম পরিত্যাগ কর। জগন্মণ্ডলে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিও না, সেখানে শুনিতেছি স্বার্থের হাট বসিয়াছে। যেখানে নিঃস্বার্থ ব্যক্তি পাইবে তাহাকেই দলে টানিয়া মানবের উন্নতি সাধন করিবে।

"মনুষ্যগণ স্বর্গারোহণকালে গাভীর পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া বৈতরণী অতিক্রান্ত হয়, তোমাদিগকেও বৈতরণী অতিক্রম করিতে হইবে। তোমরা হাতে কোদাল, কুড়ুল এবং কাস্তে নামক তিন প্রকার আয়ুধ অথবা লাঞ্ছন লইয়া নরলোকে অবতীর্ণ হও। স্বীয় দেবত্ব ভুলিয়া যাও। দীনতম মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ কর। সর্বতোভাবে তোমাদের জ্ঞান এবং শক্তিকে ফলবতী কর। যদি তাহা না পার, যদি তোমাদের দেবত্বকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ না হও, তবে আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, মর্ত্যলোকে মহাত্মা গান্ধী নামে একব্যক্তি যে ভাবে সবরমতী আশ্রম গুটাইয়া দিয়াছেন, আমিও তেমনই স্বর্গের দুয়ারে চাবি দিয়া দিব। ভাল চাও তো নামিয়া পড়।"

দেবসভায় ঈদৃশী বক্তৃতা কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই। পিতামহের রোষও ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। ভবিষ্যতে সকলের খাটুনি বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া দেবগণ দুশ্চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মর্ত্যলোকের সেই নাটকের অভিনয়টি একেবারে মাটি হইয়া গেল।

স্বস্তিক

একবার পূজার সময়ে বাঁকুড়া শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে 'নূতন চটি' নামে এক পল্লী আছে। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা বা স্বাস্থ্যকর জায়গা বলিয়া সে সময়ে এই দিকে অনেকগুলি নূতন বাড়ি তৈয়ারী হইতেছিল। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বাঙলা দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি অধ্যাপনা কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর নূতন চটিতে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার বাড়ির নাম 'স্বস্তিক'। তিনি বাঁকুড়ায় উপস্থিত আছেন সংবাদ পাইয়া একদিন বিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

যোগেশবাবু যে সময়ে কটকে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমার সহপাঠীগণের নিকট তাঁহার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। যে সকল ছাত্র যোগেশবাবুর কাছে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা করিত, তাহাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেন। কলেজে উঠিতে কতগুলি সিঁড়ি ভাঙিতে হয়, পড়িবার ঘরে কয়খানি কড়িকাঠ আছে, মহানদীর পুলে স্তম্ভের সংখ্যা কত —এ সকল প্রশ্ন সহসা করিলে যাহারা প্রত্যহ কলেজে পাঠ করিতে আসে অথবা মহানদীর কূলে বেড়াইতে যায়, তাহারাও ঠিকমত বলিতে পারিত না। যোগেশবাবু তখন তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিতেন, নিজের দৃষ্টিকে সর্বসময়ে সতেজ রাখা বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শিক্ষা। আজ হয়তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য আমাদিগকে গাছের পাতার আকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইতেছে, তাহার বৃদ্ধি ও আহারপ্রণালী সম্বন্ধে

গবেষণা করিতে হইতেছে। হয়তো পরবর্তী জীবনে এ সকল জ্ঞানের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সূত্র ধরিয়া আমাদের মন যে সকল বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহাকেই তিনি সকলের বড় লাভ বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখাইতেন।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রের নিকট যদিও আমি নিজে পড়ি নাই, তবু পাঠ্যাবস্থায় কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখনও তাঁহার প্রশ্নের বাণে সময়ে সময়ে বিব্রত হইতে হইলেও তাঁহার মনের জীবন্ত ও যৌবনসুলভ ভাবে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সেইজন্য বাঁকুড়ায় সুযোগ পাইয়া প্রথমেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করিলাম।

নূতন চটিতে পৌছিয়া স্বস্তিক খুঁজিয়া পাইতে দেরী হইল না। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র পশ্চিম দিকে একটি খোলা বারান্দায় চেয়ারের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ দেখাইতেছিল এবং দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুতে তাঁহার মুখমণ্ডলকে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার চোখে একটি স্থির ও শান্ত দৃষ্টি বিরাজ করিতেছিল।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বসিবার পর তিনি কুশল প্রশ্নাদির পরে নানা গল্প আরম্ভ করিলেন। অবশেষে শিল্পশাস্ত্রের প্রসঙ্গে নিজের বাড়ির কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বল তো বাড়ির নাম ‘স্বস্তিক’ রেখেছি কেন?” আমি আসিবার সময়ে গৃহের উত্তর দিকে একটি বড় স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম। তাহার উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন, “ও তো একটা কারণ, কিন্তু তাছাড়া আরও দুইটি কারণ আছে।” —বলিয়া শিল্পশাস্ত্রের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, যে গৃহের পূর্বে অলিন্দ থাকে তাহাকে স্বস্তিক বলে। কিন্তু তাহার পর

বলিলেন, "আরও একটা বিশেষ কারণ কি জান? সাধারণতঃ লোকে শান্তি চায়। আমি বাপু শান্তি চাই না, স্বস্তি চাই। মানুষের মন যখন যুদ্ধে হার মানে তখনই সে শান্তি চায়। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম তো অবিরাম চলবে, মাঝে মাঝে দু-এক দণ্ড স্বস্তি পেলেই যথেষ্ট। এই হল বাড়ির স্বস্তিক নাম রাখার আসল কারণ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু চারিদিকে যদি ঝড়ঝাপটাই থাকে, মন স্বস্তি পাবে কেমন করে?" তিনি সম্মুখে বাহু প্রসারিত করিয়া আকাশের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, সূর্য অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশ তখনও সূর্যাস্তের বর্ণে লাল এবং হলুদ রঙের মেঘে সজ্জিত হইয়া আছে। উপর হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে, কিন্তু পশ্চিমের রঙ তখনও যেন ছাড়িয়াও ছাড়ে নাই।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দেখেছ। এই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? এই যেন আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে।"

বুঝিলাম বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মন আজও পূর্বের মতই প্রদীপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, বার্ধক্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

সন্তোষ সিংহ

সন্তোষ আমাকে কয়েকদিন হইল চিঠি লিখিয়াছে—"এধারে পুকুর কাটার কাজ শেষ হ'লেই আবার অন্য একটা কাজ আছে—কংগ্রেসের সভ্য করা। জেলা কংগ্রেস আমাদের হাতে ভার দিয়েছে, সে জন্য খুব চেষ্টা ক'রে সভ্য সংগ্রহ করতে হবে।

"এখানে বেশ এখন একটা-না-একটা কাজ নিয়ে আছি। দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে। আমার একটা বদ্ অভ্যাস যে যদি constant workএর মধ্যে না থাকি তবে আর মন টিকতে চায় না। কিন্তু এখন নাগাড় কাজের মধ্যে আছি ব'লে দিনগুলো কেমন কেটে যাচ্ছে।

"একটা পুকুর কাটার ভার আমার উপরে। সে জন্য রোজ এক বেলা তিন মাইল দূরে অন্য গ্রামে থাকতে হয় আর বিকেলে এখানে এসে খানিকক্ষণ ক্ষেতে কাজ করি। সন্ধ্যার পর স্নান করে কাগজ পড়তে পড়তে রান্না হয়ে যায়। খেয়ে দেয়ে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার সময়ে শুই। কোথা দিয়ে যে রাত কেটে যায় জানতেও পারি না। আবার ভোরে উঠে স্নান করে নলদা গ্রামে চলে যাই। এমনি ভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।"

বাস্তবিক আশ্চর্য ছেলে এই সন্তোষ। কাজে তাহার কোনদিন ক্লান্তি নাই, পরের বেগার দিতে তাহার জুড়ি পাওয়া ভার। যতক্ষণ শরীরে সামর্থ্য আছে ততক্ষণ বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করিয়া যাইবে, কেহ না বলিলে বিশ্রাম সে কিছুতেই করিবে না। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জেলখানায় একত্র বাস করিবার সময়ে দেখিয়াছি, বহু লোকের রন্ধন

করিবার ভার গ্রহণ করিয়া সে ধোঁয়ায় গরমে এক মনে কাজ করিয়া যাইতেছে। দিনের পর দিন অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহার চোখে কালি পড়িয়া গিয়াছে, নিজের ময়লা জামা-কাপড় কাচিবার পর্যন্ত সময় পায় নাই। তবু যতক্ষণ না অপরে তাহাকে ছুটি দিয়াছে ততক্ষণ সে নিজে কখনও ছুটি চায় নাই। পরের একটা মিষ্ট কথায় সন্তোষ একেবারে গলিয়া যাইত। কিন্তু কেহ আপনা হইতে তাহার দিকে না চাহিলে সে কোনও ছুতা করিয়া কাহারও দৃষ্টি অকের্ষণ করিতে পারিত না।

সন্তোষ আলস্যকে যেমন ঘৃণা করিত, সর্বপ্রকার হীনতার প্রতিও তাহার সেইরূপ ঘৃণা ছিল। জেলখানায় তামাকের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সন্তোষের একটি দুর্বলতা ছিল। সে প্রহরীদের মারফত লুকাইয়া, নস্য, সাবান প্রভৃতি আমদানি করিত। প্রহরীগণ সর্বদা তাহার কাছে চিঠি লেখাইতে আসিত বলিয়া সন্তোষের উপকার করিতে তাহাদেরও ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু সন্তোষের গুণের মধ্যে সে একা কখনও কিছু ব্যবহার করিত না। তাহার নস্য এবং সাবানের বহু অংশীদার জুটিয়া গেল। একদিন বিকাল বেলায় দেখি সন্তোষ শুষ্কমুখে ওয়ার্ডের পাশে কাঁটা তারের বেড়ার ধারে বসিয়া আছে, তারে কতকগুলি পাজামা ও গামছা শুকাইতেছে। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় সে ট্যাক হইতে কৌটা বাহির করিয়া মোটা এক টিপ নস্য লইয়া বলিল, "দেখুন না, পাজামা কেচে শুকোতে দিয়েছিলুম, কে তার বদলে একটা ময়লা পাজামা রেখে আমারটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। যত সব চোর এই জেলখানায় জুটেছে।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "চোর জেলখানায় থাকবে না তো কোথায় থাকবে?"

অধিকাংশ সত্যাগ্রহীর প্রতি দারুণ রাগ লইয়া বাহির হইয়া

আসিলেও কিন্তু সন্তোষ কংগ্রেসের কাজ ছাড়িল না। জেল হইতে বাহির হইয়া সে আমাদের সঙ্গে বীরভূমে কংগ্রেসের আপিসে যোগ দিল। কিন্তু অল্পদিনে বুঝিতে পারিলাম যে তুই বৎসর কারাবাসের ফলেও তাহার স্বভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই।

তাহার স্নেহের অত্যাচার আমাদের সকলকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হইত, এড়াইবার যো ছিল না। একদিন মশারি টাঙাইয়া রাত্রে সন্তোষ আর আমি এক বিছানায় শুইয়া আছি। গল্প করিতে করিতে ঘুম আসিয়াছে, মশারি ফেলিয়া দিয়া ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছি এমন সময়ে সন্তোষের নজর পড়িল যে মশারির চাল ঠিক সমান নাই, একটি খুঁট কিছু উপরের দিকে উঠিয়া রহিয়াছে। অমনি চোখের ঘুম মাথায় চড়িল, সন্তোষ মশারির চাল খাটিয়ার তক্তার মত সমান করিবার কাজে লাগিয়া গেল। একবার করিয়া একটা খুঁট বাঁধে আবার ভিতরে আসিয়া দেখিয়া যায় কোথাও কোঁচকাইয়া আছে কি না; আবার অপর দিক হয়তো কষিয়া দেয়, না হয় আমাকে একটু ধরিতে বলে। এমনি করিয়া অনেক ধস্তাধস্তির পর তাহার বিশ্বাস হইল যে মশারিতে আর কোথাও কোন ত্রুটি নাই। ইতিমধ্যে আমাদের নড়া চড়ার সুযোগে কয়েকটি নিরীহ মশক মশারির ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সন্তোষ সন্ধান পাওয়া মাত্র কুলুঙ্গি হইতে এক পয়সা দামের একটি লাল মোমবাতি জ্বালাইয়া আমাকে ধরিতে বলিল এবং নিজে একটির পর একটি মশা মারিতে লাগিল। আমার চোখ তখন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে। কিন্তু সন্তোষের উদ্যোগপর্বে বাধা দিবার সাহস হইল না। অবশেষে তাহার মশা-মারা শেষ হইলে তবে ঘুমাইয়া বাঁচি।

শুধু কি তাই ? নিজের উপরেও তাহার অত্যাচারের সীমা ছিল না ? একদিন খদ্দরের হিসাবপত্র দেখিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম জানালার

ধারে মাদুরে শুইয়া সন্তোষ একটা ছোট ওষুধের শিশি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। হঠাৎ সে কেমন একটা বিকট শব্দ করিয়া উঠিল এবং উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া হাঁপানি রোগীর মত দারুণ হাঁপাইতে লাগিল। ঘর তখন ইউক্যালিপ্‌টস অয়েলের গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহার চোখমুখের অবস্থা দেখিয়া মুখে মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলাম এবং জোরে বাতাস করিতে লাগিলাম। সন্তোষ একটা কথাও বলিতে পারিতেছিল না, নিশ্বাস টানিতে তাহার খুব কষ্ট হইতেছিল।

প্রায় পনর মিনিট পরে সে স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জাগিয়া উঠিলে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিল, কে তাহাকে জানাইয়াছে নাকের মধ্যে কোন রকমে আধ আউন্স্‌-টাক ইউক্যালিপ্‌টস অয়েল ঢালিয়া দিতে পারিলে তাহার আর জীবনে কখনও সর্দি হইবে না। এক গাল হাসিয়া সে এখন বলিল, "এবারে দেখবেন আর জীবনে কখনও ঠাণ্ডা লাগবে না। পাঁচ আনা দিয়ে এক আউন্স্‌ কিনে এনেছিলুম, সবটাই একেবারে ভিতরে চলে গেছে।"

আমি তাহাকে আর কি বলিব, খালি মারিতে বাকি রাখিলাম। কোন্‌ দিন টোট্‌কা চিকিৎসায় ছেলেটা প্রাণ হারাইয়া পাপের ভাগী না করে।

খাবার-দাবারের ব্যাপারে সন্তোষের একটা অসাধারণ বৈরাগ্য ছিল। একবার শহরে তাহাকে কংগ্রেস আপিসের ভার দেওয়া হইল। কাজের মধ্যে কংগ্রেসের সভ্য করিবে, চরকা বিলি করিবে এবং কাটুনিদের কাছে সুতা সংগ্রহ করিয়া তাঁতিবাড়ী বুনিতে দিয়া আসিবে। তাহার সহিত আরও দুই তিন জন কর্মী ছিল। কিন্তু তাহারা সকলে অলস এবং শুধু ঝোঁকের মাথায় উগ্র রকম কাজ করায় অভ্যস্ত। এক জায়গায় স্থির

হইয়া কাজ করার মত ধৈর্য তাহাদের ছিল না। সন্তোষ কংগ্রেস আপিসের ভার গ্রহণ করিবার প্রায় দুই মাস পরে আমি একদিন উপস্থিত হইয়া দেখি সে একাই রহিয়াছে এবং তাহার শরীরও কিছু দুর্বল এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অপর কর্মিগণ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "তারা কিছু করবে না, এমন কি রান্না পর্যন্ত করতে চাইত না। কেবল বাজার করতে যেত আর এর ওর বাড়িতে চা খেয়ে গল্প করে বাড়ি ফিরত। আমি তাই উপরোপরি সাত দিন ভাত আর উচ্ছের অম্বল রেঁধেছিলুম। ডাল-টাল কিছু নয়। তাতেই সবাই পালিয়ে গেল।" আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি এখনও তাই চালাচ্ছ না কি? শরীরের এমন দশা হয়েছে কেন?" সে তখন জানাইল মহাত্মা গান্ধীর "আরোগ্য দিগ্‌দর্শন" পড়িয়া সে কেবল কাঁচা আহার করিতেছে। তখন শীতকাল। পালংশাক, মূলা হইতে আরম্ভ করিয়া কপি ও রাঙা আলু পর্যন্ত অপক্ক অবস্থায় উদরস্থ করিতেছে! মানুষের পক্ষে দুই বেলা আহার করা যে একটা কুসংস্কার এ জ্ঞানও ইতিমধ্যে অর্জন করিয়াছে।

তাহার জন্য বিশেষ শঙ্কিত হইলাম এবং শীর্ণ শরীরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম, "কিন্তু তোমার শরীর যে বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে।" সে দমিবার পাত্র নয়। বলিল, "না দাদা, শরীর খুব ভাল আছে। এমন হালকা লাগে যে সর্বদাই কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করে। খাবারের কথা ভাবতেও ইচ্ছা করে না। সেদিন রমেশবাবুদের বাড়িতে কাপড় দিতে গেছলুম। দেখি বৌদি, খেতে বসেছেন। মসলা-দেওয়া মাছের তরকারি দেখেই প্রথমে একবার খাওয়ার দারুণ ইচ্ছা হ'ল। তারপর জানেন কি করলুম? মনকে বললুম, 'বটে, তোমার লোভ যায় নি? আচ্ছা, আজ পালংশাকও রাত্রে বন্ধ।'

বুঝিলাম ছেলেটাকে একা ছাড়িয়া গেলে না খাইয়াই মরিয়া যাইবে। আহারতত্ত্বের সম্বন্ধে অত্যধিক জ্ঞানের ফলে হয়তো অবশেষে অনাহারেই সে প্রাণ হারাইবে। তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম। কিন্তু আমাদের হরিজন পাঠশালায় তাহাকে বেশী দিন বাঁধিয়া রাখা গেল না। নদীয়ায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইবামাত্র সে ছুটি লইয়া চলিয়া গেল এবং সেখানে নানাবিধ গুরুতর খাটুনির মধ্যে পরম সুখে থাকিয়া সম্প্রতি জানাইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া যে তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছে তাহা সে টেরই পায় না। আশ্চর্য ছেলে!

হঠযোগ

আমি যখন ইতিহাসের গবেষণা করি সে সময়ে ব্রজনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ময়লা চেহারা, বাঙলা দেশের এক অতি প্রাচীন জমিদারবংশে সচ্ছল অবস্থায় জন্ম ও লালনপালনের ফলে বেচারার স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়; অর্থাৎ মেদবহুল দেহ লইয়া তাঁহার পক্ষে নড়াচড়াই কঠিন। এমন অবস্থায় ইতিহাসের অনুসন্ধান মাঠে-ঘাটে করা সম্ভব নয় বলিয়া ব্রজনাথ পুরাকৃতিশালায় বসিয়া গবেষণার দিকে মন দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে শিলালিপি বা তাম্র-শাসন পাঠে তাঁহার বেশ দক্ষতা জন্মিল, এবং স্বদেশে বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় পুরাতন লেখমালার পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। ব্রজনাথের সুবিধা ছিল, তিনি সংস্কৃত ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। ব্রজনাথের সাংসারিক অভাবও কিছু ছিল না। জমিদারীর আয়ের উপরে পিতৃদেবের পেন্সনের টাকা সংযুক্ত হওয়ার ফলে সংসারের সম্বন্ধে চিন্তার কোনও কারণ ছিল না; মনের আনন্দে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অলঙ্কারশাস্ত্র ও প্রাচীন লিপির অর্থবোধের চেষ্টায় সুখেই কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। যথাকালে বিবাহও হইয়াছিল। স্ত্রী কমলা সত্যই লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন বুনিয়াদী ঘরের পরদার আওতায় পড়িয়া এবং বৎসরের পর বৎসর সন্তান-সন্ততি হওয়ার ফলে বেচারী অল্প বয়সেই কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইলেন এবং দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া অবশেষে সংসারের সকলকে চোখের জলে ভাসাইয়া চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রজনাথের এক

বিধবা ভগ্নী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লালনপালনের ভার লইলেন; ব্রজনাথ নিজে যেন একেবারে মত্ত হইয়া ইতিহাসের গবেষণায় ডুবিয়া থাকিবার সাধনা করিতে লাগিলেন।

এ সকল খবর অল্পে অল্পে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহার পর দেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় আসে। সেই দুর্যোগের মধ্যে কে যে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, তাহার আর সন্ধান রাখিতে পারিলাম না। দেশে দুর্যোগের পর দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে পথে রক্তের স্রোত বহিয়া গেল; কলিকাতা মহানগরীর পথঘাট দিনে-দুপুরে জনমানবশূন্য হইল। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। বাড়িঘরের দরজাজানালা বন্ধ, ছাদের উপরে শকুনের পাল কাকচিলের মত বসিয়া থাকে, আর পথের মাঝখানে বিগলিত শবদেহ লইয়া টানাটানি করে। মনে হইত যেন সমগ্র শহর শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর ভারত খণ্ডিত হইয়া দুই রাষ্ট্রে পরিণত হইল; কিন্তু তাহাতেও শান্তি আসিল না। এই সকল ঘটনার স্রোতে ব্রজনাথের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইতিহাসের গবেষণা হইতেও নিজে সরিয়া আসিয়াছি। হয়তো ইতিহাস লইয়া থাকিলে মাঝে মাঝে ব্রজনাথের নাম মনে পড়িত; কিন্তু সে পথও ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া সেরূপ যোগাযোগও ঘটে নাই।

* * *

আজ দুপুরে কাজে বাহির হইয়াছিলাম। বাড়ির গলি হইতে বাহির হইয়া যখন সদর রাস্তার ফুটপাত ধরিয়া চলিয়াছি, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ আমার সামনে আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া কিছুক্ষণ

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "ঠিক চিনতে পারছি না।" ভদ্র-লোকের পরণে পুরানো দিনের জামা ঝলঝল করিতেছে। দেহ অতিশয় শীর্ণ, হাতগুলি ততোধিক। মুখে অল্প দাড়ি গজাইয়াছে, তাহাও কাঁচায় পাকায় মেশানো। ডান দিকের চোখটি বোজা, বাঁ দিকেরটি খোলা, তাহারও রং ঘোলা। মাঝে মাঝে অন্য চোখের পাতা ওঠানামা করিলে ডান দিকের চোখটি ঈষৎ খুলিয়া আবার বুজিয়া যায়। তাহারই মধ্যে দেখিয়া মনে হয়, বেরিবেরির পর অনেকের যেমন চোখ নষ্ট হইয়া যায়, ইহারও বোধ হয় সেই রকম কিছু হইয়া থাকিবে। চাহিয়া চাহিয়া একবারও মনে হইল না যে কোনকালে ভদ্রলোককে দেখিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করার পর অকস্মাৎ ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি ব্রজনাথ উপাধ্যায়, চিনতে পারছো না ?" বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিলাম, "ভাই, তোমার এই চেহারা হয়েছে ?" তখন ব্রজনাথ নিজের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলে—

"ভাই, যা দেখছো এ সবই হঠযোগের ফল। সেই মেদ মনে আছে তো ? তার কিছুই নাই। পূর্বে দেহটা রোগের আকর ছিল। এখন যোগের বলে অপ্রয়োজনীয় কিছুই রাখি নি। খুব ভাল আছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু শরীর তো তেমন ভাল দেখাচ্ছে না। হঠযোগ করলে তার অনুরূপ আহারও তো চাই।"

ব্রজনাথ বলিলেন, "আহার এক বেলাই করি। বাবা মারা যাবার পর আয় কমে গেল। আর জমিদারীর অবস্থা তো তুমি আজকাল জানো।"

আমি বলিলাম, "একবেলা খেলেও যদি ঘি অন্তত বেশি ক'রে খাও তাহলে হঠযোগের ফলে শরীর নষ্ট হবে কেন ?"

ব্রজনাথ কিঞ্চিৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু একবেলার আহারও

যে ক্রমে অর্ধাশনে দাঁড়িয়েছে। যাক্ সে কথা। আমার বাইরে যা-ই দেখ না কেন, ভিতরে পরম শান্তিতে আছি। দু-চারজন ভক্ত আছেন, তাঁদের কৃপায় কোনও অভাব হয় না। সবই ঈশ্বরের করুণা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু এ পথ তুমি ধরলে কেমন করে? কারুর কাছে দীক্ষা নিয়েছ নাকি?"

ব্রজনাথ বলিলেন, "পথের থেকেই পেয়েছি ভাই। সাধু ফকীরেরা কৃপা করে পথেই দেখা দেন। আমিও তাঁদের দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করলাম।"

শরীরের অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি নৌলি, ধৌতি এসবও কর নাকি? আর প্রত্যহ এসব কতক্ষণ কর?"

ব্রজনাথ বলিলেন, "চব্বিশ ঘন্টা। এই তোমার সঙ্গে কথা বলছি, ভিতরে ভিতরে অবিরাম ক্রিয়া চলছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিন থেকে গুরু নিয়েছ?"

ব্রজনাথ বলিলেন, "কমলাকে তোমার মনে আছে তো? তিনি যেদিন চলে গেলেন, সেও বার বছর হয়ে গেছে। তার পরের বছর থেকেই আমি হঠযোগের পথ নিয়েছি।

হঠযোগের মূল কোথায় সে-সম্বন্ধে এরূপ অকস্মাৎ আলোকপাত হওয়ায় আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু ভাই, তোমার চোখটা কি কিছু খারাপ হয়েছে?"

ব্রজনাথ বলিলেন, "না, বিন্দুমাত্র নয়। ডান চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লেয়ারোভয়েন্সের শক্তি এসেছে; অর্থাৎ আমার তৃতীয় নেত্র শিবের মত উদ্ভাসিত হচ্ছে।"

পুরাতন বন্ধুর জন্য অকস্মাৎ অন্তরে একটা বেদনার ভাব অনুভব করিলাম। মনের এ অবস্থায় পুত্রকন্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা

হইল না। ব্রজনাথের হাত চাপিয়া ধরিয়া বিদায় লইলাম। যাইবার সময়ে তিনি নিজে হইতেই বলিলেন, "আমার বড় ছেলেটা লেখাপড়ায় বেশ ভাল হয়েছে। কিন্তু বইপত্র কিছুই তো কিনে দিতে পারি না, তাই লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। তুমি তো ভাই লেখাপড়া ভালবাসো। ছেলেটাকে একদিন পাঠিয়ে দেবো। কথা বোলো। তুমি নিজে খুশি হবে, ছেলেটারও ভাল হবে। তোমার বাড়ির নম্বরটা কি?"

নম্বর বলিলাম। ব্রজনাথ তাহা মুখস্থ করিতে করিতে হাসিমুখে বিদায় লইয়া আমাদেরই গলির পথে কোথায় চলিয়া গেল।

আবদুল গফার খান

তিন বৎসর পূর্বের কথা। সীমান্ত গান্ধী—আবদুল গফার খান তখন সবেমাত্র হাজারিবাগ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার: পুত্র আবদুল গনি শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা করিতেছিলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম যে মুক্তির পর খান সাহেব প্রথমেই পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বোলপুরে আসিবেন। বোলপুর শহরটি ছোট, সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। শহরের মুসলমান ভদ্রলোকগণ প্রায় সকলে এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমরা কয়েকজন যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। শান্তিনিকেতন হইতে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। খান সাহেব রবীন্দ্রনাথের অতিথি হইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

স্টেশনে খান সাহেবের পুত্র গনি মিঞার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কয়েক বৎসর পরে পিতার সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজিত অবস্থায় স্টেশনে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে বর্ধমান হইতে ট্রেন আসিয়া পড়িল। ট্রেন খানিতে আমরা একটির পর একটি কামরা খুঁজিতে লাগিলাম। এমন সময়ে শেষের দিকে একখানি থার্ডক্লাস গাড়ি হইতে অতি দীর্ঘকায় এক পাঠান ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরণে আধ-ময়লা পাজামা ও পাঞ্জাবি ছিল, কাঁধের উপর একটি খদ্দরের চাদর ঝুলিতেছিল। আবদুল গনি পিতাকে দেখিয়া ছুটিয়া গেলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে কথা কিছু হইল না, খান সাহেব

কেবল পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার কোলে গনিকে নিতান্ত অসহায় শিশুর মত দেখাইতেছিল।

আমরা জিনিসপত্র নামাইবার জন্য কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখি, এক কোণে একটি সুরাহি ভিন্ন কিছুই নাই। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার বিছানাপত্র কোথায়। তিনি কাঁধের চাদরে হাত দিয়া বলিলেন, ইহা ছাড়া কিছুই তিনি আনেন নাই। একটি কুঁজা আছে, তাহা নামাইবার প্রয়োজন নাই। হয়তো অপর কোনও পথিকের কাজে লাগিয়া যাইবে।

আমরা কিছু না বলিয়া তাঁহার সহিত স্টেশনের বাহিরে অগ্রসর হইলাম। শান্তিনিকেতনে পৌঁছিবার পর আশ্রমবাসিগণ খান সাহেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন, আশ্রমের ছাত্রীবৃন্দ পূজনীয় অতিথিকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিলেন। বস্তুতঃ এরূপ সহৃদয় অভ্যর্থনা খুব কমই দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

সেদিন বিকালে আবদুল গফার খান সাহেব বোলপুর শহরে জনসভায় একটি বক্তৃতা দিলেন। সন্ধ্যায় আমরা তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে অগ্রসর হইলাম। স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি গল্প করিবার জন্য খোলা আকাশের নীচে একটি খাটিয়া পাতিয়া উপবেশন করিলেন। বিশ্বভারতীর দুই-চারিজন অধ্যাপক এবং ছাত্রের সঙ্গে আমরাও তাঁহার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাজনীতির বিষয়ে কথা হইতে লাগিল। সীমান্ত প্রদেশে পাঠানগণের সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক, পাঠান জাতির ভিতরের অবস্থা, তাঁহার প্রিয় খোদাই-খিদ্‌মৎগার প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম আবদুল গফার খান সকল প্রশ্ন সোজাভাবে বিচার করিয়া দেখেন। যাহা প্রকৃত সমস্যা তাহাকে তিনি কোনও কারণে বাঁকাইয়া

ভাবিতে পারেন না। দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ এবং সমস্যার সমাধানও তিনি অতি সহজে ও সরলভাবে এবং বীর্যের সহিত নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। গান্ধীজীর সহিত এক জায়গায় প্রভেদ ঠেকিল। গান্ধীজী কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে শুধু নিজের মতানুযায়ী তাহার সমাধান করিয়া নিবৃত্ত হন না। অপর পক্ষের মতবাদকে নিজের মত অপেক্ষা বেশি শ্রদ্ধা দেখাইবার চেষ্টা করেন। অপরের মতে বিন্দুমাত্র সত্য থাকিলে তাহাকে তিনি উচিতের অধিক মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু খান সাহেব অন্যরূপ। তাঁহার দৃষ্টি নানা জটিল মতের বিড়ম্বনা বর্জন করিয়া চলে, স্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ পথ অনুসরণ করাই তাঁহার অভ্যাস।

আমাদের আলোচনার মধ্যে একটি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার ঘটিল, তাহাতে তাঁহার চিন্তার ধারা বোঝা যাইবে। সেদিন বিকালে বোলপুর শহরে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ছিল, "ধর্ম বলিতে আমি পূজাপার্বণ অথবা নামাজ বা রোজা বুঝি না। যাহা মানুষ এবং মানুষকে এক করে তাহাই ধর্ম, যাহা ভিন্ন করে তাহাই অধর্ম। যাহা অত্যাচারিতের প্রতি অত্যাচারের নিরোধ করে তাহাই ধর্ম, যাহা অত্যাচার নিবারণ করিতে সমর্থ নহে তাহা অধর্ম।" আমাদের সান্ধ্য আলোচনার মধ্যে রুশিয়ার বিষয়ে তিনি বলিলেন, "দেশটি আমার বেশ ভাল লাগে। আমি রুশিয়ার অধিবাসী মুসলমানগণকে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ধনী-নির্ধনের ভেদ নাই। সকলে পরিশ্রম করে, পরস্পরকে ঈর্ষা করে না। রুশিয়া মানবজাতিকে এক করিয়া ভাবিতে শিখাইয়াছে, পরকে ছোট করিতে বা অত্যাচার করিতে শেখায় নাই।" আমরা চাপিয়া ধরিলাম এবং বলিলাম যে রুশিয়া ধনীকে মানুষ বলিয়া গণ্য করে না, সে ধনিকতন্ত্রবাদের সহিত ধনীকেও ঘৃণা করিতে বলে। কথাটি খান সাহেবের

মনঃপূত হইল না, তাঁহার মুখে অবিশ্বাসের রেখা স্পষ্ট দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "তা কেমন করিয়া হইবে? আমি যে তাহাদের সকল ধর্মের সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি।" আমরা বলিলাম, "রুশিয়ার মধ্যে হয়তো তাহা সম্ভব, কিন্তু অন্যত্র যেখানে ধনতন্ত্রবাদ আছে, সেখানে ধনীকে ঘৃণা করাই রুশিয়ার নীতি।" খান সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা একথা কোথায় শিখিলে?" আমরা বইয়ে পড়িয়াছি বলামাত্র তিনি বলিলেন, "ইংরেজী বই? তবে একেবারেই তাহা বিশ্বাস করিও না। রুশিয়ার বিষয় সত্যকথা অপর জাতি কিছুতেই বলিতে চাহে না।" আমরা হাসিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতে আমাদের মতকে স্বীকার করিলেন না।

কেহ যেন ইহা হইতে মনে না করেন যে খান সাহেব সর্ববিষয়ে এইরূপ সরল বিশ্বাস স্থাপন করেন। সেইদিনই একটি ঘটনায় তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্যের প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গেল। অহিংসা এবং গান্ধীজীর মতবাদের সহিত সমাজতন্ত্রবাদের তুলনাকালে তিনি বলিলেন, "আমার নিকট এক মত এবং অন্য মতের মধ্যে বুদ্ধি দিয়া কোন বিচার ভাল মনে হয় না। উভয় পক্ষই দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে ইচ্ছুক। তাহার মধ্যে তুলনা করিয়া আমি দেখিতেছি যে গান্ধীজী এ পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেদিন আমার সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে সেদিন গান্ধীজীকে পরিত্যাগ করিতে আমি ইতস্ততঃ করিব না। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন তাঁহারা দরিদ্রের মঙ্গল চান। যেদিন দেখিব তাঁহারা দরিদ্রের মঙ্গলকল্পে গান্ধীজী অপেক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হইতেছেন তখন তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিব। তখন আমি পিছাইয়া থাকিব না।

আমি তো কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পাড়য়া এ পথ ধার নাই, সংসারে উৎপীড়ন নিবারণ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।"

আমরা দেখিলাম শুধু মতের শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা তিনি বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করেন না, কার্যের মধ্যে তাহার প্রমাণ খোঁজেন।

আবদুল গফার খান সাহেব শান্তিনিকেতনে দুইদিন বিশ্রাম করিবার পর ওয়ার্ধা আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেদিন যাইবেন সেদিন রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের পক্ষ হইতে জনৈক অধ্যাপককে বর্ধমান পর্যন্ত অতিথিকে আগাইয়া দিয়া আসিতে বলিলেন এবং পথে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট ফলমূল প্রেরণ করিলেন। আমরাও বর্ধমান পর্যন্ত খান সাহেবের সঙ্গ লইয়াছিলাম এবং সেখানে স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের যতটুকু আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে লজ্জার কারণ ঘটিলেও অবশেষে এক মহৎ চরিত্রের সন্ধান পাইয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিয়াছিলাম।

খান সাহেব বর্ধমানে পৌঁছিলে শহরের মুসলমান সম্প্রদায় এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে আসিলেন। চেনা নাই, শোনা নাই, তৎক্ষণাৎ সকলের সঙ্গে তিনি এমন খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে আমরা সত্যই কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার স্বভাব তো তাঁহার নহে!

পশ্চিমের ট্রেন আসিতে তখনও বিলম্ব ছিল, সেইজন্য খান সাহেবের সঙ্গে আমরা দুই তিন জন একটি ছোট দোকানে খাইতে ঢুকিলাম। খান সাহেব যথেষ্ট মিতাহারী। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আমার পাতে কিন্তু এক টুকরা রুটি তখনও অবশিষ্ট ছিল। মাঝখানে সাধারণ পাত্রে একখানি আস্ত রুটি পড়িয়া ছিল। খান সাহেব সেটিকে

তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "যার যার প্রয়োজন বল, আমি সেইমত ইহা ভাগ করিব।" আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নাই, আমি তাই আগেই একখণ্ড চাহিয়া বসিলাম। খান সাহেব কিন্তু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার পাতে এখনও রুটি রহিয়াছে, সঞ্চয় করিতে দিব না।" লজ্জায় আমার মাথা নীচু হইয়া গেল। খান সাহেব কিন্তু স্নেহভরে রুটির টুকরা প্রথমে আমাকেই দিলেন। পরে সকলকে এক এক খণ্ড বিতরণ করিলেন। সেদিনকার শিক্ষা বোধ হয় কোনদিন ভুলিতে পারিব না।

ইহার কিছুক্ষণ পরে গাড়ি আসিয়া স্টেশনে লাগিল। আমরা পিছনে একখানি ছোট কামরায় খান সাহেবের জন্য জায়গা ঠিক করিলাম। তিনি উঠিলে ফলের ঝুড়িটি গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। খান সাহেব তখন পর্যন্ত ফলের পাত্র লক্ষ্য করেন নাই, রাজনীতির আলোচনায় সারাক্ষণ মত্ত ছিলেন। এবারে ফলের ঝুড়ি তাঁহারই জন্য দেওয়া হইতেছে বুঝিয়া ফল লইতে একেবারে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, "রাত্রের খাবার এখন হইতে কেন লইব?" আমরা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় দুই হাত পাতিয়া তিনি বলিলেন, "শুধু ইহাতে যাহা ধরে তাহা দাও। ইহার বেশি লইতে পারিব না।" হাতের মুঠায় দুই-তিনটি কমলালেবু ও আপেল ধরিল, অবশিষ্ট লইতে তাঁহাকে কিছুতে রাজী করান গেল না। অবশিষ্ট ফল তাঁহার নির্দেশমত সমবেত সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল।

গাড়ি ছাড়িবার সময়ে আমরা তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার চেষ্টা করিলে তিনি বলিবেন, "কি ভাই, হাতে হাত মেলাও, পায়ে হাত কেন দিতেছ?" বলিয়া একে একে স্নেহভরে সকলকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

গুলের কাংড়া জেলার মধ্যে একটি নামজাদা গ্রাম, স্থানটি বেশ পুরাতন। এখান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে মশরুর নামে একটি স্থান আছে। সেখানে প্রায় হাজার বছরের পুরাতন তিনটি মন্দির আছে। মন্দিরের নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি পাহাড়ের চূড়ায় সেগুলি অবস্থিত। মন্দির পাথরের তৈয়ারী বটে, কিন্তু পাথর জুড়িয়া নির্মিত হয় নাই। গোটা পাহাড়ের শৃঙ্গকে এমন ভাবে কাটা হইয়াছে যে তিনটি মন্দির বাদ দিয়া অবশিষ্ট প্রস্তরের স্তূপ শিল্পীর অস্ত্রাঘাতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

গুলের স্টেশন হইতে দুইটি ছোট পর্বত অতিক্রম করিয়া মশরুরে পৌছিতে হয় ; প্রায় চার বৎসর পূর্বে যখন প্রথমে গুলেরে যাই তখন অপরাহ্ণ প্রায় চারটা বাজিয়াছে! শীতকালের বেলা, মশরুরে যাইবার আয়োজন করিতে আধঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গেল। একজন পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করিয়া সোজা উত্তর দিকে রওনা হইলাম। প্রথমে একটি ছোট্ট পাহাড় পড়িল। গাছপালা কিছু নাই বলিলেই চলে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাঙা পাথরের ভিতর দিয়া পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। কিছু দূর পরে আবার একটি চড়াই শুরু হইল। এবার বনও কিছু ঘন হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কিছু বেশি গাছ, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিরল। ঝোপঝাপের পরিমাণও সামান্য। আমাদের পথটি, সংকীর্ণ, এবং প্রায়ই তাহার সহিত আশপাশের গ্রাম্য পথ আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। অজানা

লোকের পক্ষে পথ চিনিয়া লওয়া কঠিন হইত, কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তি সঙ্গে ছিল বলিয়া আমরা দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বৃক্ষবহুল পর্বতটি অতিক্রম করিতে সূর্য অস্ত গেল। পাখীদের কলরব ব্যতীত বনে আর কিছু শোনা যাইতেছিল না। কদাচিৎ বনের মধ্যে, পথ হইতে অন্তরে, স্বল্পবিস্তীর্ণ শস্যের ক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল। শুনিলাম যে এখানে দু-চার ঘর জাঠ কৃষক বাস করে। তাহারা হিন্দু অথবা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তাহারা ভিন্ন বনের পশুর সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া আর কেহ এখানে টিঁকিতে পারে না।

জাঠ বস্তি পার হইবার কিছুক্ষণ পরে আমরা দ্বিতীয় পর্বতের শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলাম। পর্বতের পূর্বপ্রান্তে একটি উপত্যকা দেখা যাইতেছিল এবং উপত্যকার পরপারে ধওলাধারের শুভ্র কিরীটপুঞ্জ তখন অস্তমান সূর্যের প্রভায় রঞ্জিত হইয়াছিল। সেখান হইতে মশরুর আরও ক্রোশ খানেক দূরে অবস্থিত। মশরুর পৌঁছিতে আমাদের সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

মশরুর গ্রামটি পাহাড়ের নীচে, সেখানে কয়েক ঘর গোয়ালা বাস করে। উপরে মন্দির এবং তাহার পাশে ক্ষুদ্র একটি মঠে এক বৈষ্ণব বাস করেন শুনিলাম। আমি প্রাচীন মন্দিরের অঙ্গনে বসিয়া রহিলাম, আমার সঙ্গী সন্ধান করিয়া বৈষ্ণব সাধুকে ডাকিয়া আনিল। বৈষ্ণবের বয়স বেশি হয় নাই, কিন্তু তাঁহাকে বড় শান্ত প্রকৃতির মনে হইল। তাঁহার কপালে তিলক দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম, কেন না এ তিলক শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই, তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শিষ্যই বটেন। অমৃতসরে তাঁহাদের প্রধান আখড়া আছে। আমি

বাঙালী শুনিয়া সাধু অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সাধু আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে উঠিলেন। যাইবার সময়ে বলিলেন, "অসময়ে আসিয়াছেন, ঘরে সামান্য যাহা আছে তাহাতেই তৃপ্ত হইতে হইবে।" মশরুর মন্দিরের পূর্বপ্রাঙ্গণে একটি পুষ্করিণী কাটা আছে। তাহার কিনারায় ছোট উন্মুক্ত মণ্ডপের উপরে আগুন জ্বলিতেছিল। বেশ শীত করিতেছিল, আমি আগুনের পাশে ঘনীভূত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ ঘুমাইবার পর সাধু ভোজনের জন্য আমাকে ডাকিয়া তুলিলেন। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি চমৎকার রুটি এবং লাউএর একটি তরকারি তিনি পাক করিয়া ফেলিয়াছেন। সামান্য আহার্য হইলেও তাহা এমন পরিপাটিভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে সত্যই তৃপ্তি হয়।

সাধুর বড় ইচ্ছা তিনি একবার নবদ্বীপ তীর্থ দর্শন করেন। কিন্তু মশরুর তাঁহার বড়ই প্রিয়। প্রাচীন মন্দিরটি পঁচিশ বৎসর পূর্বের ভূমিকম্পে বিলক্ষণ জখম হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রধান মন্দির তখনও অটুট ছিল। তাহার মধ্যে রামচন্দ্র এবং গৌরনিতাইএর মূর্তি রক্ষিত ছিল, তিনি যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। পরদিন তাঁহার পূজা দেখিলাম। আয়োজন সামান্য, কিন্তু এমনই নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত তিনি সেবা করিতেছিলেন যে আমার নিকট তাহা বড়ই প্রীতিপ্রদ বোধ হইল।

পূজা সমাপনের পর মন্দিরে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। সাধু নিকটে আসিয়া আমাকে একবার মুক্ত মণ্ডপে উপবেশন করিতে বলিলেন। রাত্রে সেখানে শুইয়াছিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাই নাই। এখন প্রভাতের আলোয় পূর্বদিগন্তে চাহিয়া মনে হইল

পূজার উপযুক্ত স্থানেই শিল্পী মন্দির রচনা করিয়াছিলেন। নীচে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, ইতস্ততঃ গ্রাম রহিয়াছে এবং দূরে মাটির উপর কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া ধওলাধারের গগনস্পর্শী শৃঙ্গমালা আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বৈষ্ণব তখন নিজের মনের একটি বাসনা নিবেদন করিলেন। তাঁহার গুরুদেব মহান্ সাধু ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে গুরুদেব দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। গুরুদেবের একখানি ছবি রামজীর মন্দিরে রক্ষিত ছিল। বৈষ্ণব বন্ধুর ইচ্ছা, আমি তাঁহার গুরুদেবের ছবির সহিত তাঁহারও একখানি ছবি তুলিয়া দিই। এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব করিলাম না এবং পরে বাঙলাদেশে ফিরিয়া যথাসময়ে মশরুরের বন্ধুকে ছবিও পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সেই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সংস্পর্শ।

কিন্তু বৈষ্ণবের সরল হৃদয়ের কথা এখনও বার বার মনে পড়ে। সামান্য একটি গ্রামে কয়েক ঘর গোয়ালার মধ্যে থাকিয়া তিনি রামজীর সেবা লইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত দিনপাত করিতেছেন। তীর্থভ্রমণের বাসনা মাঝে মাঝে হৃদয়ে উত্থিত হয় বটে। কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হইলেই বা কি আসিয়া যায়? বর্তমানের সেবাতেই তাঁহার সর্ব সময় ভরিয়া থাকে।

কিন্তু আমাদের কোলাহলপূর্ণ জীবনের খরস্রোতে স্বভাবকে এমনই করিয়া তুলিয়াছে যে দুর্গম বন্ধুর পথের অনুসরণ ভিন্ন অন্তর পরিতৃপ্ত হইতে চাহে না। হিমালয়ের ক্রোড়েই হউক, অথবা অন্য যে কোন অবস্থার মধ্যেই হউক, পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে দিন যেন অতিবাহিত হইতে চাহে না। চারিদিকে প্রপীড়িত নরনারীর দুঃখ এবং জীবনের দৈন্য আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৈষ্ণব সাধুজনের মত শান্তচিত্তে প্রকৃতিকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও যেন আমাদের তাহাতেই হরণ করিয়া লইয়াছে।

বীরভূমে দুর্ভিক্ষ

প্রায় পনর দিন পূর্বে কার্যোপলক্ষে একবার বোলপুরে গিয়াছিলাম। বীরভূমে গত দুই বৎসর অজন্মা হইয়াছিল, এ বছরেও চাষীর ঘরে অন্ন নাই। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু অনেকে ইতিপূর্বে ক্ষুধার তাড়নায় বীজধান পর্যন্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য নূতন ধান কর্জ না পাইলে অনেকের পক্ষে চাষ করাই সম্ভবপর হইবে না। গবর্ণমেণ্ট চাষীকে টাকা কর্জ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু টাকা কম থাকায় তাঁহারা বিঘা প্রতি চার আনার বেশী দিতে পারেন নাই। ইহাতে কতটুকুই বা সুবিধা হয়? কৃষিঋণের আর এক বিপদ হইল, যাহার কিছু জমিজমা আছে সে-ই গবর্ণমেণ্টের কাছে ঋণ পায়, যাহার কিছু নাই তাহার পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা সসব নহে। অথচ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অধিকাংশ লোকের জমিজমা নাই। তাহাদের বাঁচিবার যে কি ব্যবস্থা হইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই।

যে ব্যক্তি মজুরি করিয়া খায় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট টেষ্ট রিলিফ নামে একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বীরভূমে স্থানে স্থানে পথঘাট নির্মাণ অথবা পুষ্করিণী খননের কাজ আরম্ভ হইয়াছে; সেখানে কেহ মজুরি করিলে ছয় পয়সা বা দুই আনা রোজগার করিতে পারে। কিন্তু একজন লোকের পক্ষে এত কম মজুরিতে কাজ করা বড় কঠিন। তাহার উপর আবার অনেকের দুই-চারিজন করিয়া পোষ্য আছে। ফলতঃ মজুরের সংসারে আজ গড়ে দৈনিক দুই-চারি পয়সাও মাথা পিছু পড়ে না।

গ্রামের কোনও কোনও ধনী এই সুযোগে সস্তায় মজুর খাটাইয়া দালান তুলিতেছেন, পুষ্করিণী কাটাইতেছেন, কেননা আজ টাকার দাম অত্যন্ত বেশি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা গরীবদের অসময়ে কাজ দিয়া প্রকৃত দেশের কাজ করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল এই যে এইরূপ দেশের কাজের লাভের সমস্ত অঙ্কই ধনীর নিজের খাতায় জমা হইতেছে। গরীব হয়তো দুই পয়সার মুড়ি খাইয়া বাঁচিয়া আছে; কিন্তু যিনি তাহাকে কর্মে নিযুক্ত করিতেছেন, তাঁহার প্রতি মজুরের কৃতজ্ঞতার কোনও কারণ নাই। তিনি দুর্ভিক্ষের সুযোগে সস্তায় দালান তুলিতেছেন।

বোলপুরে পৌঁছিয়াই শুনিলাম বিলাতি ইউনিয়নে অবস্থিত ধল্লা নামক একটি গ্রামে দু-এক দিনের মধ্যে রিলীফ কমিটির পক্ষ হইতে পাক্ষিক চাউল বিতরণের কার্য হইবে। শ্রীনিকেতনের বিখ্যাত কর্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষের তত্ত্বাবধানে সেখানে রিলীফের কার্য চলিতেছিল। প্রায় দুইমাস পূর্বে কর্মিগণ বিলাতি ইউনিয়নের প্রত্যেক গ্রামে প্রতি গৃহস্থের বাড়ি গিয়া কাহাকে কত দেওয়া উচিত তাহার এক তালিকা করিয়াছিলেন। সেইমত প্রতি পরিবারকে একখানি করিয়া রোকা দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা প্রতি চৌদ্দ দিন অন্তর ধল্লা কেন্দ্রে রোকায় সহি করাইয়া নিজের প্রাপ্য চাউল লইয়া যাইত। রিলীফ কমিটির আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। একটি পরিবারের সকলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিবার মত সঙ্গতি তাহাদের নাই। হয়তো তিন-চারি-জনের মধ্যে একজনকে পুরা অর্থাৎ চৌদ্দ দিনের জন্য ছয় সের নয় ছটাক ও একজনকে অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার সের চাউল দেওয়া হয়। তাহাতেই সমগ্র পরিবারটিকে চালাইয়া লইতে হয়।

ধল্লা বোলপুর হইতে প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা

কালীমোহনবাবুর সঙ্গে যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা প্রায় নয়টা। তখনও বেশি লোক সেখানে জমে নাই। বেলা দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে রোকা লইয়া সকলে উপস্থিত হইল এবং তখন স্থানীয় কয়েকজন কর্মীর সাহায্যে চাউল বিতরণের কাজ আরম্ভ হইল। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের যিনি প্রেসিডেণ্ট তাঁহারই বাড়িতে কেন্দ্র করা হইয়াছিল। তিনি বর্ধিষ্ণু লোক এবং রিলীফের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন। সেইজন্য কালীমোহনবাবু তাঁহার সহযোগিতায় কাজ করিতেছিলেন। এদিকে ধল্লা গ্রামে গবর্ণমেণ্টেরও একটি রিলীফ কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। সেখানে চাউলের বদলে নগদ পয়সা দেওয়া হইতেছিল। গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রে প্রায় ১২০ জনকে এবং রিলীফ কমিটির কেন্দ্রে ১০৪।১০৫ জনকে সেদিন চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইল। ইউনিয়নের ২৯ খানি গ্রামের মধ্যে ইহাদেরই অবস্থা সর্বাপেক্ষা খারাপ, না খাইয়া ইহারা প্রায় মরিতে বসিয়াছিল। যাহারা অনাহারে রহিয়াছে তাহাদের জন্য অতিরিক্ত কোনও ব্যবস্থা করা রিলীফের পয়সায় কুলাইবে না। আর অর্ধাহারের কথা ধরিলে বীরভূমে সে অবস্থা তো লাগিয়াই রহিয়াছে! আজ তাহা নূতন নহে।

যাহারা চাউল লইতে আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও শিশু। দুর্ভিক্ষের যে সকল ছবি সচরাচর কাগজে ছাপা হয় ইহাদের চেহারা সেরূপ নহে। সকলকেই যে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার দেখাইতেছিল তাহা নহে। দুই-চারিজন অবশ্য দেখিতে সেই রকম। কিন্তু অবশিষ্ট সকলকেই শুধু দুর্বল দেখাইতেছিল, অথবা তাহাদের দেহে স্পষ্টই রোগের চিহ্ন বর্তমান ছিল। একটি ছোট মেয়ের বেরিবেরিতে ভুগিয়া পা ফুলিয়া গিয়াছিল। তাহার কোমরের উপর

সবই নগ্ন। চোখ মুখ ফুলিয়াছিল। পায়ে একগাছি সরু দড়ি বাঁধা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম বাতের ফোলা ভাবিয়া কোনও গুণী সেখানে একটি মন্ত্রপূত দড়ি বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহাতে আর কতটুকুই বা উপকার হইবে? হয়তো অবিরাম মাস চার পাঁচ চিকিৎসা করাইলে ইহার শরীর ভাল হইতে পারে। আরও দুই একজন স্ত্রীলোককে দেখিলাম; একজনের মাথা কিছু খারাপ হইয়াছিল। জাতিতে হাড়ি বা ডোম হইবে। পাগলের মত আবদার করিয়া কথা কহিতেছিল। আবদার করিয়া, খানিক হাসিয়া বলিতেছিল, "তোরা দিবি না? চাল দিবি না?" পাগলীর চেহারা দেখিয়া সে যে দুর্ভিক্ষপীড়িত তাহা হয়তো মনে হইবে না। কিন্তু গ্রামের চৌকিদার বলিল, সে দুইদিন ধরিয়া ঘরে শুইয়াছিল। চালে খড় নাই, বৃষ্টির জলে মেঝেতে কাদা হইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে জোর করিয়া গ্রামের অন্য মেয়েরা ধল্লায় আসিবার সময় পাগলীকে ধরিয়া আনিয়াছে।

আরও একজন চাষীকে দেখিলাম। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু অনাহারে খানিক শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকে ইতিপূর্বে সাময়িকভাবে চাউল দেওয়া হইতেছিল। আজ তাহার রোকা কাটিয়া দিয়া অপর একজন আর্ত বৃদ্ধাকে চাউল দিবার ব্যবস্থা করা হইল। বৃদ্ধ চাষীর চোখ মিনতিতে ভরিয়া আসিল। সে বারান্দায় একটি থামের আড়াল হইতে দু'-একবার খুব ক্ষীণস্বরে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে নিবেদন করিল যে, চাষ-আবাদের কাজ আরম্ভ হইলেও সে এখন পর্যন্ত কাজ পায় নাই। ঘরে পাঁচ ছয়জন খাইবার লোক, তাহাকে আরও কিছুদিন চাউল দেওয়া হউক। কিন্তু রিলীফের সংকীর্ণ পুঁজির জন্য তাহাকে আর সাহায্য দান করা সম্ভবপর হইল না।

চাউল বিতরণ শেষ হইতে বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। যাহাদের ন্যায়তঃ পাইবার কথা তাহারা ছাড়া আরও অনেকগুলি ভিক্ষার্থী ছিল। তাহারা কেহ উঠানে মাথা কুটিয়া, পায়ে হাত দিয়া কালীমোহনবাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু টাকারই যখন টানাটানি তখন ইচ্ছা থাকিলেও দিবার উপায় তো নাই।

কাপড়ের অভাবও খুব বেশি দেখিলাম। কলিকাতা হইতে মাসখানেক পূর্বে কিছু ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ হইয়াছিল বটে কিন্তু একমাসের মধ্যেই তাহার অনেকগুলি ছিঁড়িয়া কুটিকুটি হইয়া গিয়াছিল। দু'-একটি নূতন কাপড়ের টুকরা দিয়া একজন কুড়ি বৎসরের মেয়ে কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করিতেছিল।

সমস্ত বিতরণের কার্য শেষ হইলে, যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমরা অতিথি হইয়াছিলাম তিনি আমাদের খাইবার আয়োজন করিলেন। আমরা বাহিরের কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছি, বিশেষ করিয়া শ্রীনিকেতনের কালীমোহনবাবুর সঙ্গে, সেই জন্য আমাদের খাইবার ব্যবস্থা নানা উপচারের রচিত হইয়াছিল। ভাল চাউলের গরম ভাত, গাওয়া ঘি, পুকুরের মাছের ঝোল, দই, সব যখন ক্রমে ক্রমে আমদানি হইতে লাগিল, তখন লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাইতে লাগিল। গৃহের কর্তা সরল মনেই অবশ্য আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া অর্ধাহারক্লিষ্ট এতগুলি নরনারী ও শিশুকে দেখিবার পর এই অন্ন খাইবার প্রবৃত্তি একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল। বাহিরে প্রার্থীর দল তখন অনেকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। যাহারা দূর গ্রামে বাস করে তাহারা চাউল বা পয়সা

লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কেবল নিকটের গ্রামের দু'-চারজন নারী তখনও আরও দুই চার পয়সার লোভে আমাদের খাওয়া শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। একটি মেয়ে রাস্তার পাশে এক চালার নীচে বসিয়া থামে ঠেসান দিয়া ছেলেকে মাই খাওয়াইতেছিল এবং প্রতিবেশী অপর একজন নারীকে চাউলের পুঁটুলিটি ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইতে সাহায্য করিতেছিল।

ঘরের ভিতর হইতে মেয়েগুলিকে দেখা যাইতেছিল এবং তাহারাও মাঝে মাঝে আমাদের খাওয়ার দিকে চাহিতেছিল। গৃহস্বামী সেইজন্য জানালার নীচে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন; কিন্তু লজ্জায় আমাদের মুখে ভাত রুচিল না। নিতান্ত চোরের মত তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া লইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এই দারিদ্র্যের পাশে আমাদের স্বচ্ছলতা কত হীন, কত নিষ্ঠুর দেখায়। শুধু কয়েকজনকে মুষ্টি-ভিক্ষা দিয়া বা কাপড় বিতরণ করিয়া আমরা হয়তো অনাহারজনিত মৃত্যুর হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু এই যে আমাদেরই কারণে বহু লোক আত্মসম্মান ভুলিয়া আজ ভিখারী হইয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার কোথায়? অস্থায়ী রিলীফের দ্বারা কেহ কেহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু কালীমোহনবাবু স্বয়ং বলিলেন, ইহার কোন কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা করা করা যাইতেছে না, তাহাই হইল আসল কথা।

বস্তুতঃ ভিক্ষাদান দারিদ্র্যের প্রতিকার নহে। যতদিন না সমাজের ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনের দ্বারা দারিদ্র্যকে দেশছাড়া করা যায়, সকলের মনে আত্মসম্মানের বোধ ফিরাইয়া আনা যায়, ততদিন আমাদের কাজ শেষ হয় নাই ধরিতে হইবে। মানুষের অন্তরাত্মাই যেখানে মরিয়া যাইতেছে সেখানে শুধু দু'মুঠা চাউল দিয়া

কতটুকু বা উপকার হয়? রিলীফ, যদি বছরের পর বছর দিতেই হয়, তবে তাহাতে অমোদের লজ্জা ও ক্ষোভ ভিন্ন আর কিছুর কারণ নাই।

কিন্তু যতদিন বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত না হইতেছে, ততদিন দারিদ্র্য ঘুচিবারও কোনও সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

মহাত্মা গান্ধী

১৯৩৪ সালে নভেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর বাঙলা দেশে ফিরিতেছিলাম। আমার সহযাত্রীগণের মধ্যে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি ছিলেন। বি. এন. আরের পথে কলিকাতা আসিতে হইলে নাগপুরের নিকটে ওয়ার্ধা স্টেশন পড়ে। ওয়ার্ধার আশ্রমে তখন সীমান্তের নেতা আবদুল গফার খান সাহেব অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল গনি বিদেশ হইতে রাসায়নিকের কার্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শিল্পকলায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকায় তিনি চাকরি না লইয়া শিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে গনি সাহেব অধ্যাপক কৃপালানির তত্ত্বাবধানে বাস করিতেন। উল্লিখিত সময়ে ছুটি উপলক্ষে তিনি ওয়ার্ধায় পিতার নিকট বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। পিতাপুত্র উভয়ে কৃপালানি সাহেবকে ওয়ার্ধায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তিনি সেইজন্য একদিন ওয়ার্ধায় কাটাইবার সংকল্প করিলেন। আমিও সহযাত্রী হিসাবে এই সুযোগে মহাত্মা গান্ধীকে দর্শন করিবার লোভে তাঁহার সহিত নামিয়া পড়িলাম।

আবদুল গফার খান ও তাঁহার পুত্রের আশীর্বাদে ওয়ার্ধায় আমাদের কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজের অতিথিশালায় আমরা স্থান পাইলাম। সেদিন সন্ধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক কৃপালানি খান সাহেবের নিকট গান্ধীজীর

সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথা উত্থাপন করিলেন, খান সাহেবও এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকার সময়ে গান্ধীজী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। সারা দুপুর আনন্দে ও উদ্বেগে কাটিয়া গেল। একখানি ছোট খাতা লইয়া, আমি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিবার মত চারিটি প্রশ্ন লিখিয়া রাখিলাম। বিকালবেলায় চারটার কিছু পরে খান সাহেব, তাঁহার পুত্র, অধ্যাপক কৃপালানি ও আমি দল বাঁধিয়া যমুনালালজীর অতিথিশালা হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে মহাত্মাজীর আশ্রমের অভিমুখে রওনা হইলাম।

ওয়ার্ধা ছোট শহর এবং আশ্রমটি তাহার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। আশ্রমে কয়েকটি বাড়ি আছে এবং কিছু শাকসবজি এবং তুলার ক্ষেতও রহিয়াছে। পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গান্ধীজী যে বাড়িটিতে ছিলেন তাহা ছোট হইলেও দোতলা। দোতলায় মাত্র একখানি বড় ঘর ও তাহার চারিদিকে খোলা ছাদ। ছাদে দু'-চারজন লোক চলাফেরা করিতেছেন দেখিলাম। বাড়িটির কাছে পোঁছাইতে দেখা গেল পথের ধারে এক জায়গায় স্তূপাকার কতকগুলি পাথর জড় করা রহিয়াছে। এমন পাথর এ অঞ্চলে যত্র তত্র পাওয়া যায়। এখানে হয়তো রাস্তা নির্মাণের জন্য এগুলিকে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। আশ্রমের বারান্দায় উঠিয়া গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিয়ারেলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পিয়ারেলালজীর ঘরের পাশে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে একজন স্বেচ্ছাসেবিকা মেঝেতে বসিয়া তকলি কাটিতেছিলেন এবং প্রহরীর কার্য করিতেছিলেন। সিঁড়ির পাশে আমরা দেখিলাম একটি মাঝারি গোছের কাল ব্লাকবোর্ড রহিয়াছে এবং তাহাতে গান্ধীজী সারাদিন কখন কাহার

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন তাহা খড়ি দিয়া লেখা রহিয়াছে। সেই ফর্দে লেখা ছিল সাড়ে চারটার পর হইতে একঘণ্টা গান্ধীজীর অবকাশ। সেইটি তাঁহার সান্ধ্য আহারের সময়, অতএব আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা আহারের অবসরে হইতে থাকিবে ইহা জানিতে পারিলাম।

আবছুল গফার খান সাহেব আমাদিগকে নীচে বসাইয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেলেন, কেহ তাঁহার পথরোধ করিল না। তাহার পর তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছাদের প্রান্ত হইতে আমাদের উপরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমরা উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে প্রহরী স্বেচ্ছাসেবিকাটি আমাদিগকে জানাইলেন গান্ধীজীর এখন খাইবার সময়, বাহিরের কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু খান সাহেব উপর হইতে তাঁহাকে নির্দেশ দিতে তিনি পথ ছাড়িয়া দিলেন।

উপরে উঠিয়া দেখিলাম গান্ধীজী একটি বড় ঘরের এক ধারে একটি ছোট ডেস্কের সামনে বসিয়া লিখিতেছেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিতে তিনি আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং পাশে শতরঞ্চির উপর বসিতে বলিলেন। আমরা বসিলে তিনি নিজের কাজ বন্ধ করিয়া কথাবার্তার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে ছুইজন স্বেচ্ছা-সেবিকা তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গান্ধীজী কিছু ছুধ, কয়েকটি পরিষ্কারভাবে ছাড়ান কমলালেবু ও খানিক মধু খাইলেন। পাশে একটি পাত্রে কৃত্রিম দন্ত রক্ষিত ছিল, খাইবার পূর্বে গান্ধীজী তাহা পরিয়া লইলেন, আবার খাওয়া শেষ হইলে তাহা ধুইয়া রাখিয়া দিলেন। কমলালেবুগুলি গান্ধীজী একটি চামচের সাহায্যে আহার করিতে লাগিলেন। বাসনপত্র, তোয়ালে, চাঁদর প্রভৃতি সবই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলাম কোথাও এতটুকু ময়লা নাই।

খাইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধীজী প্রথমে আবদুল গনির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি ঠিক হইল বল ?" আবদুল গফার খান সাহেবের পুত্র হইলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে গনির কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল শিল্পবিদ্যায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করিবেন, অথচ পিতার ইচ্ছা যে তিনি সীমান্ত প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনকে যে কোন উপায়ে হউক সাহায্য করুন। এই ব্যাপার লইয়া পিতাপুত্রে মতানৈক্য চলিতেছিল এবং গান্ধীজীর উপরে ইহা মীমাংসা করিবার ভার পড়িয়াছিল। সেইজন্য গান্ধীজী কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম।

গান্ধীজী আবদুল গনিকে প্রশ্ন করিবার পরই অধ্যাপক কৃপালানির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ত' কয়েক মাস গনিকে দেখিতেছেন, আপনি কি মনে করেন শিল্পে তাহার ঠিক মতি আছে ? নন্দলালবাবু কি বলেন ?" বন্ধুবর উত্তরে জানাইলেন যে নন্দবাবু গনির প্রতিভার খুব প্রশংসা করিয়াছেন বটে তবে তাহাকে খুব নিষ্ঠার সহিত সাধনায় লাগিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরিশ্রম না করিলে তাহার প্রতিভা বজায় থাকিবে না ইহাও বলিয়াছেন। অবশেষে কৃপালানি সাহেব বলিলেন, "Ghani flirts with his art, he has not yet taken it as seriously as he should." কথা শুনিয়া গান্ধীজী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "See that he does not flirt with anything else." আমাদের কথাবার্তা এতক্ষণ যে গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে হইতেছিল, গান্ধীজীর রসিকতায় তাহা এখন হাল্কা হইয়া গেল। গনি লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। গান্ধীজী তখন তাঁহার শান্তিনিকেতনবাসের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ লইতে লাগিলেন। জানা গেল যে কাঠের মূর্তি নির্মাণে গনির

বিশেষ প্রতিভা আছে, কিন্তু নন্দলাল বসু বলিয়াছেন যে তিনি নিজে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে অপারগ। গান্ধীজী শুনিয়া বলিলেন, "তা' হউক, তিনি ত' শিল্পের মূল রসটি আয়ত্ত করিয়াছেন—he knows the poetry of carving—অতএব গনির পক্ষে তাঁহার নিকট থাকা বিশেষ প্রয়োজন।" গনি মিঞা কিন্তু তখন বাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পিতার অর্থে নির্ভর না করিয়া তিনি কোথাও রাসায়নিকের চাকরি করেন এবং অবসর পাইলে শিল্প শিক্ষা করেন। গান্ধীজী ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া খান সাহেবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, "হুঁ, আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি।" খান সাহেব অপরাধীর মত বলিলেন, "আজ্ঞে আমি ত' গনির শিল্পে বাধা দিতেছি না, উহার দ্বারা কেবল জনসাধারণের কোন সেবা হউক ইহাই আমি চাই। আমাদের সীমান্তে নিজেদের পত্রিকা আছে, গনি যদি তাহার ভার লয় তাহলেই আমি যথেষ্ট মনে করিব। পোস্ত লেখায় উহার বেশ নাম হইয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া সৈনিকদের মধ্যে গনি অগ্রসর হইবে এরূপ আশা আমি করি না।"

গান্ধীজী কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর বলিলেন, "না, গনির পক্ষে এখন এই শ্রেণীর কাজ চলিবে না। তাহাকে এখন চাকরিই করিতে হইবে। আমি যমুনালালজীর সাহায্যে কোনও চিনির কারখানায় কাজের চেষ্টা করিব। তবে গনি, তুমি আমায় কথা দাও যে তুমি শিল্পবিদ্যা ছাড়িবে না এবং যে কয় মাস চিনির কল বন্ধ থাকে সে সময়ে শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বাবুর কাছে গিয়া থাকিবে।" এরূপ মীমাংসায় গনি পরম আনন্দিত হইলেন। খান সাহেব নীরবে তাহা মানিয়া লইলেন। আমরা আশ্চর্য হইলাম যে নিজে পরের সেবায় ও রাজনীতির জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা সত্ত্বেও গান্ধীজী কত সহজে

একজন তরুণ শিল্পীর স্বকীয় সত্যকে স্বীকার করিয়া লইলেন। পরে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে গনি সাহেব যুক্তপ্রদেশে একটি কায়খানায় চাকরি পাইয়াছেন, কিন্তু শিল্পসাধনা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা জানি না।

গনির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হইবার পর গান্ধীজী আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Now tell me something about yourself." আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে কাজ সারিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু গান্ধীজী প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। আমি জীবনে কি করিব স্থির করিয়াছি, কত খরচ করি, আয় কত, বিবাহ করিয়াছি কিনা, করিব কিনা, প্রায় সব। অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নও এত সহজ সরলভাবে করিতেছিলেন যে কিছুই অপ্রীতিকর বোধ হইল না। বন্ধু ঘনিষ্ঠ সংবাদ যেমনভাবে জানে তেমনিভাবেই তিনি প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে পরীক্ষক বা বিচারকের ভাব বিন্দুমাত্র ছিল না।

ব্যক্তিগত পরিচয় শেষ হইবার পর আমাদের আলোচ্য বিষয়ে কথা উঠিল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটকাল ধরিয়া গান্ধীজী ধীরভাবে আমাদের সকল প্রশ্নের ও প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ইংরেজীতে কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার ভাষা যেমন সরল তেমনই স্পষ্ট। কিন্তু কিছুক্ষণ ইংরেজীতে কথাবার্তা হইবার পর খান সাহেব বলিলেন যে তাঁহার পক্ষে সমস্ত কথা বুঝিবার অসুবিধা হইতেছে। তখন গান্ধীজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন আমি উর্দু বুঝি কিনা। আমি মোটামুটি উর্দু বুঝিতে পারি কিন্তু বলিতে পারি না। সেইজন্য আমার প্রশ্নগুলি ইংরেজীতে হইতে লাগিল এবং গান্ধীজী অত্যন্ত সরল হিন্দুস্তানী বা উর্দুতে তাহার জবাব দিতে

লাগিলেন। এই কথোপকথনের বৃত্তান্ত ১৩৪২ সালে "দেশে" পূজার সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইংরেজীতে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে "মডার্ণ রিভিউতে"ও বাহির হইয়াছিল। অতএব তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

সেদিনকার প্রশ্নের শেষে গান্ধীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি আর কতদিন ওয়ার্ধায় থাকিব। আমার পরদিন প্রাতঃকালে চলিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু প্রশ্নাদি সবগুলির মীমাংসা না হওয়ায় গান্ধীজী যাওয়া স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। এরূপ নিমন্ত্রণ বহু ভাগ্যের কথা, আমিও দ্বিধা না করিয়া পরদিন আশ্রমে থাকিয়া গেলাম। সেদিন এবং পরদিনও গান্ধীজীর ভোজনান্তে আমরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইলাম। খোলা মাঠের উপর দিয়া এক মাইল যাওয়া এবং এক মাইল আসা হইল। লক্ষ্য করিলাম গান্ধীজী উঁচুনীচু পথেও বেশ দ্রুত চলিতেছেন। বেড়াইবার সময়ে আশ্রমের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, গান্ধীজী তাঁহাদের সঙ্গে নানাবিধ কথা বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। ফিরিবার সময়ে হঠাৎ দেখি গান্ধীজী তুই তিন খণ্ড পাথর কুড়াইতেছেন এবং অপর সকলেও তাঁহার দেখাদেখি সুবিধামত পাথর খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গনি মিঞাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে প্রত্যহ এইরূপ হইয়া থাকে এবং তুবেলাই, অর্থাৎ সকালে এবং সন্ধ্যায় গান্ধীজী কিছু কিছু পাথর তুলিয়া লইয়া যান। আশ্রমের পথ খারাপ হইয়া যাওয়ায় ঠিকাদারগণ তুই তিন হাজার টাকা চাহিয়া বসিয়াছিল। সেইজন্য গান্ধীজী সকলকে লইয়া প্রত্যহ কিছু কিছু পাথর সংগ্রহ করিতেছেন। আশ্রমের সম্মুখে আমরা যে পাথরের স্তূপ দেখিয়াছিলাম তাহা ঐভাবে নির্মিত হইয়াছে। খান

সাহেব স্বীয় মোটা চাদরে বেশ কতকগুলি বড় পাথরের টুকরা বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিলেন। একজন স্বেচ্ছাসেবিকাও নিজ শক্তির অতিরিক্ত একখণ্ড পাথর লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। গান্ধীজী মেয়েটির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, রাজপুতনী কিনা, তাই গায়ের জোরের এত জিদ রহিয়াছে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নামিয়া আসিতেছিল। আমরা সকলে মহাত্মাজীর পিছনে সার বাঁধিয়া পাথরের বোঝা লইয়া আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

বুদরো

গ্রামের নাম বুদরো। অজয় নদীর ধারে যেখানে কল্যাণপুর হইতে পারুলডাঙার রাস্তাটি খেয়াঘাট পার হইয়া গিয়াছে তাহারই ক্রোশখানেক পশ্চিমে বুদরোর অবস্থান। বুদরো এক সময়ে বেশ বড় গঞ্জ ছিল, প্রতিদিন হাট বসিত, বহু নৌকা লাগিত এবং ধান, চাল, তরি-তরকারি, হাঁড়িকুড়ি বিস্তর কেনাবেচা হইত। কিন্তু নদীর উপর দিয়া রেলের লইন যাইবার পর হইতে গ্রামটি ক্রমে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। একে একে চৌধুরীর কোঠাবাড়ি, তিলিদের ঠাকুর-দালান সবই পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে, কোন বাড়িতে এখনও ছুই এক জন বৃদ্ধা বিধবা হয়তো বাস করে, সন্ধ্যায় প্রদীপ দেয়, কোনটিতে বা তাহাও নাই। লোকাভাবে বহু বাড়ির উঠানে ঘেঁটু, আকন্দ, শিয়ালকাঁটা গজাইয়াছে, চিলের কোঠায় বটের চারা ধরিয়া দেয়াল ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার উপর আশপাশের গ্রাম হইতে যে যাহা পারিয়াছে, ছুয়ার, জানালা, এমন কি কড়িবর্গা পর্যন্ত খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। এক একটা বাড়ির চাল ধসিয়া গিয়া আকাশপানে হাঁ হইয়া আছে। একটি বাড়ির উঠানে তুলসীমঞ্চের উপর কে কবে জলের ঝারা বাঁধিয়া দিয়াছিল, কতকাল হইল তুলসীগাছ মরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঝারার পাশের বাঁখারি ছুইটি আজও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপরের দড়ি উইএ খাইয়া ফেলিয়াছে, ভাঙা হাঁড়ির টুকরা এখনও নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিবার লোক আর হয় নাই।

এই সকল জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত কোঠাবাড়ির আশেপাশে কদাচিৎ দুই একখানি কুটীর দেখা যায়। সেগুলিতে চাষীরা বাস করে। তাহারা সুবিধামত পরিত্যক্ত বাড়ির উঠানে ধান ঝাড়াইএর ব্যবস্থা করিয়া লয়, কিন্তু বাড়িগুলি যেমন তেমনই পড়িয়া থাকে। চাষীদের কুটীর ছোট এবং নীচু, পাশের বিশালকায় অট্টালিকার চাপে তাহাদের যেন দম আটকাইয়া যায়। সেইজন্য অধিকাংশ চাষী বুদরো হইতে কিছু অন্তরে ঘরদুয়ার তুলিয়া বাস করিয়া থাকে, কোঠাবাড়িগুলিকে তাহারা যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে। সেগুলিকে নির্মূল করিয়া কেহ নূতন গ্রামের পত্তন করিতে সাহস করে না, অথচ অবস্থান হিসাবে বুদরো নদীর ধারে যে জায়গাটি দখল করিয়া আছে তাহা যথার্থ ই ভাল।

একজন মুসলমান যুবকের সহিত নদীর পাশে সাক্ষাৎ হইল। তখন দিনদুপুর হইবে, কিন্তু সে আমার সহিত পুরাতন বাড়িগুলির ভিতর ঢুকিতে কিছুতে রাজী হইল না। বলিল, সেখানে দিনের বেলাতেও ভূত চলাচল করে এবং সুযোগ পাইলেই মানুষের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। সাপখোপের ত' কথাই নাই, এই সেদিন চাষীরা খামার করিতে গিয়া এক জোড়া অতি প্রাচীন চন্দ্রবোড়া সাপ মারিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে জগদ্দলের মত গ্রামে জীর্ণ দালানগুলির বোঝা চাপিয়া আছে, তাহাকে সবাই মিলিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া ফর্দা মাঠ করিয়া ফেল না কেন? বুকের উপর মানুষ এতখানি বোঝা সহে কেমন করিয়া? মুসলমান যুবকটির জ্ঞান খুব, সে বলিল, "কাজ কি বাবু? আমাদের ওবাগে না গেলেই তো হল।"

উত্তরটি শুনিরা আশ্চর্য হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই তো হিন্দুসমাজদেহের মধ্যেও এমনই কত যুগের পুরাতন অট্টালিকারাজি

জমিয়া রহিয়াছে, যাহা হয়তো তিলিদের ভাঙা ঠাকুরদালানের মত এক সময়ে কত প্রাণীকে আশ্রয় দান করিয়াছে, কতজনকে আনন্দ বিতরণ করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার শবদেহ সমাজের অনেকখানি দখল করিয়া রহিয়াছে, এবং বুকের বোঝার মত মানুষের প্রাণকে নিষ্পেষিত করিতেছে। মানুষ তাহার প্রভাব হইতে পলাইবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকে। বুদরোর প্রাচীন ভূতের মত তাহা আজও আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আমরা জাতিতে হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই। আমাদের সকলের মন নিরানন্দ এবং আশাহীনতায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া আছে।

আর পাশেই পারুলডাঙার সাঁওতালগণের বস্তি। তাহারা বুদরো হইতে হয়তো আধ ক্রোশ তফাতে একখণ্ড উঁচু জমির উপরে ঘর বাঁধিয়াছে। তক্‌তকে ঘরগুলি, পরিচ্ছন্নভাবে নিকানো। ঘরের বউ দিনান্তে একবার কাদার প্রলেপ দিয়া যায়, আবার সময়মত দুয়ারের পাশে হাতী, ঘোড়া ও মানুষের ছবি—লাল, সাদা এবং কালো রং মিশাইয়া আঁকিয়া থাকে। সারাদিন খাটে, খাটুনির মধ্যে পুরুষেরা দুপুরবেলায় বউয়ের হাতে আনা ভাত ও শাক ঝক্‌ঝকে জামবাটিতে আহার করে, কর্মের মধ্যে গান গায়, অবসর পাইলে বাঁশি বাজায়, ফুল সংগ্রহ করে, নাচে, মদ খায়, পশুপাখীকে বাগে পাইলে শিকার করে, নয়তো পোষও মানায়—তাহাদের জীবন দরিদ্র হইলেও কতই না আনন্দরসে সিঞ্চিত হইয়া আছে! তাহাদেরও যে পুরাতনের বালাই নাই, তাহা নয়। তবে সে পুরাতন তাহাদিগকে মোহগ্রস্ত করিতে পারে নাই। হয়তো গ্রামে উপর্যুপরি কয়েকজনের মৃত্যু হইল। অমনই গোটা বস্তির লোক সাব্যস্ত

করিল যে এখানে আর থাকা চলিবে না। তাহারা বাসা তুলিয়া পুরাতন বাড়ি একেবারে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করিয়া আবার নূতন ডাঙায় গিয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে। কতই না তফাত দুই জাতির মধ্যে! অথচ প্রভেদটি কোথায়? প্রভেদ মনে। একজন প্রাচীন গ্রামের মত জীর্ণতার ভারে অবসন্ন ও ক্লিষ্ট হইয়া আছে, আর একজন বহমান নদীর মত প্রাচীনের আঘাতে এক একবার ঘোলা হইয়া উঠিলেও নিজের স্রোতধারাকে কিছুতেই আবদ্ধ ও পঙ্কিল হইতে দিতেছে না। ইহাই দুইজনের মধ্যে প্রভেদ। একজন প্রাচীন প্রাণবান শরীরের কঙ্কাল, আর একজন প্রাণবান নদীর মত শক্তির আধার। এই সজীবতার জলধারাকে আশ্রয় করিয়া আবার হয়তো মানুষের বাস, নূতন সভ্যতা, নূতন ধর্ম গড়িয়া উঠিতে পারে—পুরাতনটির মধ্যে যেন তাহার সম্ভাবনাও আজ আর নাই।

সাধক

১৯৩০ সালে যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছিল সেই সময়ে ডাক্তার আশুতোষ দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমার পরিচয় হয়। তাহার কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের আলাপ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সময়েই যেন অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আইন অমান্যের ফলে বাঙলাদেশের বহু কর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন, অথচ বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন বিস্তারলাভ করে নাই। এই অবস্থায় আশুতোষ দাস দুই তিন জন বন্ধুর সঙ্গে বীরভূম হইতে পদব্রজে মেদিনীপুরের অভিমুখে রওনা হন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যতগুলি গ্রামে সম্ভব কংগ্রেস এবং সত্যাগ্রহের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

এই যাত্রাপথে আমি তাঁহার সহিত ছিলাম। মানুষকে তীর্থভ্রমণের সময়ে মুক্ত আকাশের তলে অথবা রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নের পরিশ্রম এবং ক্লান্তির মধ্যে যেমন ভাবে খুঁজিয়া পাওয়া যায় তেমন আর সচরাচর অন্য উপায়ে যায় না। হয়তো বা যায়! মৃত্যুর অমোঘ পদধ্বনি যখন মানুষ নিজের হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পায় তখনও তাহার জীবনের সকল মিথ্যা আবরণ ঝড়ের সামনে ধূলাবালির মত উড়িয়া যায় এবং তাহার সত্যময় মূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আশুদার মৃত্যুর পূর্বকালে যে উজ্জ্বল ভয়শূন্য মূর্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা দর্শনের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই, কারণ তিনি অসুখের সংবাদ কাহাকেও জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আহত সিংহ

যেমন নিঃসঙ্গ বীর্যে মৃত্যুর সহিত অন্ধকার গিরিগুহায় একান্তে হিসাবনিকাশ করিতে চায় তিনিও তেমনই করিয়াছিলেন। তাই শেষের দিনে তাঁহার দর্শন পাইলাম না। ইহার জন্য আমার কোনও ক্ষোভ নাই, সে ভাগ্যই তো আমি করি নি।

বীরভূম জেলা হইতে আমরা যখন বর্ধমানের অভিমুখে রওনা হইয়াছিলাম তখনও যথেষ্ট গরম রহিয়াছে। আশুদার শরীরও বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা বিন্দুমাত্র তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, তিনি জোর করিয়াই তাহাকে চালিত করিতে লাগিলেন। পথে যে সকল গ্রাম পড়িত, তাহার কোথাও কোথাও স্থানীয় কংগ্রেসকর্মিগণ সভার আয়োজন করিতেন। কিন্তু আশুদার মধ্যে আমরা সর্বদা একটি বিষয় লক্ষ্য করিতাম। যে কোন গ্রামে চিকিৎসকের সাক্ষাৎ মিলিত, সেখানেই আশুদা তাঁহার সহিত গভীর আলাপ করিতেন এবং গ্রামবাসিগণ প্রধানতঃ কোন্ কোন্ রোগে কষ্ট পায়, চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনও উন্নতি বিধান সম্ভব কিনা, এই সকল বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেন। লক্ষ্য করিতাম, গ্রামের চিকিৎসকগণ যাহাতে সেবাধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, তিনি বারংবার তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

বাস্তবিক আশুদার নিজের জীবনেও এই আদর্শই সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের দরিদ্র পল্লীবাসীর নিকট রোগযন্ত্রণার মধ্যে সেবা পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম ব্রত ছিল। দেশ স্বাধীন হউক, ইহা তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও তাঁহাকে ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখি নাই। তিনি স্বাধীনতার নাগপাশ মোচন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন,

কেননা উহারই বশে আমাদের গ্রামে দারিদ্র্যের করাল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রোগে শোকে ভারতবর্ষের জনগণ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দুঃখ মোচনের সাধনায় তাঁহার যেন কোনও ক্লান্তি ছিল না। শরীর যখন আর বহে না, তখনও বর্ষার কর্দমাক্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রোগীর মুখে এক বিন্দু ঔষধ পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। জননীর একমাত্র সন্তানকে যখন বাঁচাইতে পারেন নাই তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সকলের অজ্ঞাতসারে রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অশ্রুবর্ষণে শোকাচ্ছন্ন জননী কোনও সান্ত্বনালাভ করিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এই সেবাধর্ম চিকিৎসকের মনে জগতের সকল সত্যের মূলে দুঃখের অস্তিত্ব যে মহাসত্যের আকারে প্রতিভাত হইয়াছিল আমরা তাহা সম্যকভাবে বুঝিতে পারি।

এই দুঃখের গুরুভার মোচনের জন্য তাঁহার কতই না চেষ্টা, কতই না যত্ন ছিল। পাছে নিজের শরীরের কোনও দুর্বলতা ক্ষণেকের জন্য অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এই ভয়ে তিনি সর্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। নিজের সকল আমিত্বকে নিঃশেষে দহন করিয়া জীবনকে কেমনভাবে নিরবচ্ছিন্ন মানবসেবার উপাদানে পরিণত করা যায় ইহাই তাঁহার সর্বোত্তর সাধনা ছিল।

জেলখানার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। আশুদা সে সময়ে বিচারকের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়া কারাভোগ করিতেছিলেন। শুইবার জন্য তাঁহাকে লোহার স্প্রীংযুক্ত খাট দেওয়া হইয়াছিল। একটি পুরানো খাটে শুইবার ফলে কয়েকদিন ধরিয়া আশুদা পিঠের বেদনায় বড় কষ্ট পাইতেছিলেন, সেঁকতাপ করিয়াও কোন ফল হইল না। তিনি একদিন বিমর্ষভাবে আমাদের বলিলেন, হয়তো তাঁহার মেরুদণ্ডে ক্ষয়রোগ হইয়াছে। তাহার অল্পদিন পূর্বে আশুদার

পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ রোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। আশুদার মন হয়তো সেইজন্য বিকল হইয়াছিল বলিয়া তিনি নিজের সামান্য ব্যথাকে গুরুতর রোগের লক্ষণ বলিয়া কল্পনা করিয়া বসিলেন। আমরা কিন্তু বিছানা স্প্রিঙের খাট হইতে নামাইয়া মেঝের উপর করিয়া দিলাম; দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যে আশুদারও গুরুতর রোগের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিল। আশুদার ক্ষয়রোগের কথা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখে উল্লেখ করিলে তিনি আমাদের সঙ্গে আমোদে হাসিতেন।

কারাগারের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য এই দুর্বলতার ছায়াটুকুর ফলে আমরা আশুদাকে মানুষ হিসাবে যেন আরও নিবিড়ভাবে লাভ করিলাম। মনে হইল, নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য যে সাধকটির চেষ্টার অন্ত নাই, তাঁহারই জীবনের অন্তরালে আমাদের মত দুর্বল একজন মানুষও বাঁচিয়া আছে, হয়তো বা পথের বাঁকে হঠাৎ তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং নিজেদের মত লোক বলিয়া চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। আশুদা কিন্তু অন্তরালের সেই মানুষটিকে লইয়া সর্বদা বিব্রত থাকিতেন। পাছে সুবিধা পাইয়া সে তাঁহাকে জীবনের ব্রত হইতে বিচ্যুত করে এই ভয়ে তিনি সর্বদা তাহাকে কঠোর শাসনে বাঁধিয়া রাখতেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ আজও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। রোগে, অজ্ঞানে, অন্ধকারে দরিদ্র পল্লীর অধিবাসিগণ আজও তেমনই পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। বাঙলার একটি ক্ষুদ্র পল্লী-কোণে সেই তমসাকে দূরীভূত করিবার জন্য যে বীর সাধক স্বীয় জীবনকে আহুতি দিয়া পূজার প্রদীপ জ্বালিতেছিলেন, দুঃখের দেবতা একান্তভাবেই সে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বগ্রাসী মহাকালের

তৃপ্তির জন্য আরও কতজনের জীবনকে এমনই নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয়, তখন অসহযোগ আন্দোলন শেষ হইয়াছে, এবং কেহ বা কাউন্সিলে, কেহ গঠনকর্মে মন দিয়াছেন। অল্পদিন পরিচয়ের পরে একদিন বিগত আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া সতীশদা বলিলেন, গান্ধীজী আসায় আমরা আজ বুক ফুলিয়ে সদররাস্তায় বলতে পারছি—স্বাধীনতা চাই। এর আগে সকলের সামনে এ কথা বলার জো ছিল না, পথে চলতে চলতে ছাতার আড়াল দিয়ে মুখ লুকিয়ে পার হয়ে গেছি, পাছে কোনও পরিচিত মানুষ অপ্রত্যাশিত স্থানে আমাদের দেখতে পায়। এ মুক্তি যে কত বড়, তোমরা ঠিক ধারণা করতে পারবে না। কথাটা তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক সতীশদা অত্যধিক ভাবপ্রবণ ছিলেন। আর তাহার চরম প্রকাশ পাওয়া গেল, ১৯৩০ সালে প্রথম স্বাধীনতা-দিবসের উৎসবের সময়ে। কংগ্রেস হইতে নির্দেশ আসিল, ২৬এ জানুয়ারি জাতীয়-পতাকা উড়াইয়া স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য পাঠ করিতে হইবে। কলিকাতার পথে পথে প্রতি গৃহে সেদিন ত্রিবর্ণ-পতাকা উড়ানো হইল, কিন্তু সতীশদা শক্তি প্রেসের উপরে কিছুতেই পতাকা উড়াইতে দিলেন না। পরের দিন রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সতীশদার মুখে অত্যন্ত থমথমে একটি ভাব লক্ষ্য করিলাম। তিনি কেবল বলিলেন, তুলি নাই, কারণ তুলিলে আর নামাইতে পারিব না। আর দুই-চার কথা বলার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, তাঁহার মন যেন আর বাহিরের কথায় সাড়া দিতেছে না। এমন অবস্থায় উঠিয়া পড়িলাম। তাহার

পরদিন প্রেসের জন্য একটি বাড়ি দেখিবার কথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে সকালে শক্তি প্রেসে পৌঁছিয়া শুনিলাম, সতীশদা কাল রাত্রেই সন্ন্যাসরোগে মারা গিয়াছেন। তখনও দোতলার ঘরে চাপা কান্নার রোল শোনা যাইতেছিল।

আমি তখন শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলী প্রমুখ সতীশদার সতীর্থগণকে সংবাদ দিতে বাহির হইলাম। বিপিনদা শুনিয়া বলিলেন, আজ সত্যসত্যই আমরা একজন বড় লোককে হারাইলাম।

পরে বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া শুনিয়াছিলাম, পতাকা-উত্তোলনের ব্যাপার লইয়া আমাদের মধ্যে যে তর্ক উঠিয়াছিল, সেই উত্তেজনার বশে সতীশদা গতরাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারেন নাই। পরে বউদি যখন অকস্মাৎ টের পাইলেন, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

তুলসীদা

ছেলেবেলার সান্‌ডে স্কুলের প্রভাবেই বোধ হয় মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে যাহারা টেরি কাটে তাহারা ভাল ছেলে নয় এবং যে কেহ ভাল জামা জুতা পরিয়া গন্ধ মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার কস্মিনকালেও লেখাপড়া হয় না। এরকম ছেলে যে আমাদের ক্লাসে না পড়িত তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের কিছুতেই সগোত্র বলিয়া ভাবিতে পারিতাম না। কলেজে প্রবেশ করিয়াও এ ধারণা অনেক দিন ঘুচে নাই, ঘুচিতে সময় লাগিয়াছিল। যাঁহার প্রভাবে ইহা মুছিয়া গিয়াছিল সে তুলসীদা আজ নাই, হয়তো বাঁচিয়া থাকিলে আমার মতের পরিবর্তনে তিনি খুশীই হইতেন। কিন্তু আজ তাই বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

কলেজে যখন পড়ি তখন অমিয় নামে একজন ছাত্র আমাদের ক্লাসে পড়িত। তাহাদের বাড়ি আমাদের কাছেই ছিল এবং দুইজনে সর্বদা একসঙ্গে পড়াশুনা করিতাম। কোন কোন দিন দিবারাত্র তাহাদের বাড়িতেই কাটিয়া যাইত। অমিয়দের বাড়িতে লোকজন বেশি ছিল না। একদিন সেখানে তাহার এক দূর-সম্পর্কের দাদা আসিয়া উদয় হইলেন। তাঁহার নাম তুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায়, আমিও অমিয়র সঙ্গে তাঁহাকে তুলসীদা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম।

তুলসীদা বরাবর পাড়াগাঁয়ে মানুষ, পড়াশুনা অল্প বয়সেই ইস্তফা দিয়াছিলেন, ইদানীং শহরে একজন ঠিকাদারের কাছে চাকরি জোটায়

এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি খুব মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আমাদের স্নেহ করিতেন বটে, মাঝে মাঝে গল্পও করিতেন, কিন্তু আমরা ঠিক নিবিড়ভাবে তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে পারিতাম না। হয়তো বয়সের তারতম্যের জন্য তিনি আমাদিগকে একটু দূরে দূরে রাখিতেন।

তুলসীদার একটি সৌখীন অভ্যাস ছিল, তাহা লইয়া অমিয় এবং আমি দুই জনেই গোপনে খুব আন্দোলন করিতাম। তুলসীদার টেরি একটি দেখিবার মত জিনিস ছিল। তিনি ঘাড় একদম ছাঁটিয়া সামনের চুল লম্বা করিয়া রাখিতেন এবং প্রত্যহ স্নানের পর ভিজা চুলে একখানি বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া টেরি বাগাইতেন। টেরির পাতা কাটিতে তাঁহার আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের কম সময় লাগিত না। তাঁহার টেরি কাটা হইতে হইতে স্কুলের ছেলেদের স্নান করা খাওয়া সবই সমাপন হইয়া যাইত, তিনি কিন্তু অদম্য উৎসাহে ডান দিকের পাতা কখন নামাইয়া কখন উঠাইয়া নিজের বদনের শোভা বৃদ্ধি করিতেন। ইহা আমাদের নিকট খুবই একটা হাসাহাসির ব্যাপার ছিল। তাহার উপর আবার তুলসীদা বিড়ি খাইতেন। থার্ড ক্লাসে পড়িবার সময় একবার বিড়ি খাইয়াছিলাম। কিন্তু বোধ হয় বিড়িটা খারাপ ছিল বলিয়া তাহা এত বিস্বাদ লাগিয়াছিল যে চিরকালের জন্য বিড়ির ধোঁয়ার উপর একটা বিজাতীয় ক্রোধ থাকিয়া গিয়াছে। তুলসীদার বিড়ি খাওয়ার অভ্যাসের জন্য আমরা মনে মনে তাঁহাকে আরও খাটো করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছিলাম।

এ হেন তুলসীদার সঙ্গে ক্রমশঃ খানিকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল শেষ পর্যন্ত লোকটিকে মন্দ লাগিত না। আগের আড়ষ্ট আলাপ তখন অনেকাংশে কাটিয়া গিয়াছিল, এবং দুই-এক দিন আমরা

তুলসীদার প্রিয় টেরির কথা লইয়া উপহাসও করিয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া মুচ্‌কি হাসিতেন এবং বোধ হয় আমাদিগকে নিতান্ত বালক-বোধে কিছু বলিতেন না।

দুই বৎসর পড়িবার পর অমিয় পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইল, আমরাও অন্য পাড়ায় উঠিয়া গেলাম। অমিয়র সঙ্গে দেখাশুনা প্রায় হইত না, আমিও পড়ার চাপে তুলসীদার কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পরে আমাদের এক বন্ধুর বিবাহ-সভায় অমিয়র সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। পুরাতন দিনের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহাকে একে একে বাড়ির সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তুলসীদা কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায় অমিয় সংবাদ দিল তুলসীদা মারা গিয়াছেন, এবং কেমন করিয়া তিনি মারা গিয়াছেন সে কাহিনীও অতি বিচিত্র।

অমিয় যে বৎসর মেডিকেল কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারের পরীক্ষা দেয় সেই বৎসর তুলসীদার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহে তুলসীদা নাকি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বৌদিকে গান শিখাইবার জন্য সদ্য সদ্য একটি হারমোনিয়ম ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার মাস ছয় পরেই তুলসীদা যে ঠিকাদারের নিকট চাকরি করিতেন তাঁহার কাজে নাগপুরে বদলি হইয়া যান। নাগপুরে তিনি এক মেসে থাকিতেন এবং পূজার সময় একবার ছুটি লইয়া বাড়ি আসিলেন। নাগপুরে সংসার পাতিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়তো অর্থাভাববশতঃ বৌদিকে সেখানে লইয়া যাইতে পারেন নাই। ছুটির পর তুলসীদাকে একাই নাগপুর ফিরিতে হইয়াছিল।

দুই বৎসর পূর্বে নাগপুরে প্লেগের ভীষণ মড়ক হয়। যাহারা পশ্চিমের মড়ক দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন ইহার অর্থ কি! শহরে

যাহারই অবস্থা ছিল সেই পলাইয়া বাঁচিল। আপিস কাছারি সবই বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত শহর যেন শ্মশানের আকৃতি ধারণ করিল। তুলসীদা যে মেসে থাকিতেন সেখানকার বাসিন্দা কেরানির দল তল্পিতল্পা গুটাইয়া অন্যত্র রওনা হইলেন। কিন্তু বাসায় এক জনের হঠাৎ প্লেগ দেখা দিল। চাকর বামুন যে যেখানে ছিল সকলে পালাইয়া গেল। তুলসীদা একা কেবল রোগীর সেবা করিবার জন্য রহিয়া গেলেন।

পাড়ায় একজন সদাশয় ডাক্তার ছিলেন, তিনি দয়া করিয়া প্রত্যহ রোগীর তত্ত্ব লইতেন। প্রায় এক সপ্তাহ মৃত্যুর সহিত অবিশ্রান্ত যুঝিবার পর ডাক্তার রোগীর অবস্থা ভাল বলিলেন এবং তখন একজন ঠিকা চাকরের উপর তাঁহার শুশ্রূষার ভার দিয়া তুলসীদাকে শীঘ্র বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিলেন। সেদিন সকালে তুলসীদার সামান্য জ্বর দেখা দিল। জ্বর বেশি নয়, কিন্তু সেবাযত্নের অভাব হইবে বলিয়া রোগী এবং ডাক্তার উভয়ে তাঁহাকে পত্রপাঠ বাড়ি রওনা হইতে বলিলেন। উভয়ের অনুরোধে তুলসীদা রাজী হইলেন এবং ডাক্তারবাবু স্বয়ং ষ্টেশনে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া রেলে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া তুলসীদার হু হু করিয়া জ্বর বাড়িতে লাগিল। গভীর রাত্রে তিনি জ্বরে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। প্রাতঃকালে গাড়ি একটি বড় ষ্টেশনে থামিলে কামরার অন্যান্য যাত্রিগণ প্লেগ সন্দেহে রেলের গার্ডকে খবর দিল। গার্ডও রোগীর অবস্থা খারাপ দেখিয়া দুই জন কুলীর সাহায্যে জিনিসপত্রসমেত তুলসীদাকে প্লাটফরমে নামাইয়া ষ্টেশনমাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিল। তুলসীদার তখন বাক্‌শক্তি রোধ হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সেই প্লাটফরমেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেখিতে দেখিতে প্লাটফরমে যাত্রীদের ভিড় জমিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ তখন ডোমের সাহায্যে শবদেহ সরাইয়া লইয়া গেলেন। যাত্রীর নাম ঠিকানার জন্য তাঁহার বিছানাপত্র খোঁজা হইল। মাথায় বালিশের নীচে কম্পিত হস্তে লেখা মাত্র এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল, "আমার যদি অসুখ করে এই ঠিকানায় তার করিও।" নিম্নে শুধু বৌদির নাম ও ঠিকানা দেওয়া ছিল। সেই চিঠি কালক্রমে বাড়িতে আসিয়া পৌঁছায়, তাহাতেই সকলে তুলসীদার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াছিলেন।

অমিয়র কাছে তুলসীদার সংবাদ শুনিয়া সেদিন মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। বিষণ্ণ অন্তঃকরণে বিবাহসভার শেষে বাড়ি ফিরিলাম। তুলসীদাকে আগে কখনও সাহসী বলিয়া কল্পনা করি নাই। কিন্তু যে লোক জীবনে এমন চরম বীরত্বের কার্য করিতে পারে তাহাকে কোন দিন মনে মনেও ছোট ভাবিয়াছিলাম বলিয়া বারংবার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত কাহারও পোশাক পরিচ্ছদে অত্যধিক পারিপাট্য দেখিতে পাইলে আমার তুলসীদার কথা মনে পড়িয়া যায়।

শচীন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে একটি বস্তু আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা হইল তপস্যার ভাব। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের কারাবাস শেষ হইবার পর তিনি এই বিশ্বাস লইয়াই ফিরিলেন যে জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত প্রচেষ্টার দ্বারা যদি স্বরাজের সংকল্প গড়িয়া তোলা না যায়, যদি কংগ্রেস কর্মীদের মনে গান্ধীজীর আদর্শ এবং উপায় সম্পর্কে সঠিক ধারণার সৃষ্টি করা না যায়, তবে কংগ্রেসের তরণী হালবিহীন নৌকার মত কোন্ ঘাটে যে গিয়া লাগিবে তাহার স্থিরতা নাই।

শচীন্দ্রনাথ অতি শান্ত, অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন, ধৈর্যের বিচ্যুতি তাঁহার ঘটিত না। কিন্তু কংগ্রেস যথাযথভাবে মুক্তির আদর্শ লইয়া চলিতেছে না, অথবা অহিংসার আদর্শ আপাতত স্বীকার করিলেও তাহার জন্য পর্যাপ্ত চেষ্টা করিতেছে না, ইহা স্মরণে আসিলেই তাঁহার মধ্যে অসহিষ্ণুতার আভাস দেখা যাইত। যাঁহার ভাণ্ডারে বিপুল কর্মশক্তি বর্তমান, যিনি সমর্পিতপ্রাণে স্থির লক্ষ্যের অভিমুখে চলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অপরের মন্থরগতি পীড়ার কারণ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? ধৈর্যহারা হইয়া শচীন্দ্রনাথ কেবলই ভাবিতেন, বেলা যে বহিয়া যায়, তবু যাত্রী কোথায়? নিজে যে সকল কর্মে লিপ্ত ছিলেন, অপরের আলস্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি নিরলসভাবে শুধু খাটিয়াই যাইতেন না, শরীরের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতেন না। কর্মের বহ্নিতে নিজেকে দগ্ধ করিয়া তিনি এই আশ্বাস লাভ করিবার

চেষ্টা করিতেন যে অন্ততঃ নিজের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য মূল্য দিতে তিনি কুণ্ঠা করেন নাই। জীবনের শেষ অঙ্কে তিনি সেই মূল্যদানের চরম পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য শচীন্দ্রনাথের স্মৃতির নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি আছে, সংসারী মানুষ বাঁচিতে চায়, কিন্তু সন্ন্যাসী মরণযজ্ঞে লিপ্ত থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুকে সার্থক করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করে। দেশে বহুযুগব্যাপী জড়তার ভার অন্ধকারের মত প্রাণশক্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। কত জীবনের বহ্নি-শিখা জ্বলিলে তবে এই গাঢ় তিমিরের অবসান ঘটিবে জানি না। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের মত শাস্ত্রযোধী, সমর্পিত প্রাণ তাপসের তপস্যার দ্বারাই শুধু সেই তমসা মিটিতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনে যিনি প্রতিমুহূর্তের পরিশ্রমের দ্বারা জাতীয় প্রাণধারাকে মুক্তির পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মরণে যোড়শোপচারে প্রাণের পূর্ণ আহুতি দিয়া তিনি সেই যজ্ঞকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

অথচ মরণের প্রতি কোন আকর্ষণও তাঁহার ছিল না। উন্মত্ত মানুষকে প্রেমের বারিসিঞ্চনে নম্র করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথের বাঁকে মৃত্যুর ছায়া তাঁহাকে অকস্মাৎ আহ্বান করিল। কর্মকে পরিহার না করিয়া জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইলেন। মৃত্যুর সম্ভাবনাকে তিনি পরিপূর্ণ উপেক্ষার দ্বারা পরাস্ত করিলেন। মৃত্যুর পরেও যে প্রশান্তির ছাপ জড় স্তব্ধতায় তাঁহার মুখে আবদ্ধ রহিল, তাহার তুলনা হয় না। জীবনে বহু মৃত্যুর দর্শনলাভ ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে মহৎ মৃত্যু-দর্শনের সৌভাগ্য লাভও করিয়াছি। তবু শচীন্দ্রনাথের বেলাতেই মুখের নিশ্চল প্রশান্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, 'হে মহামরণ, তোমাকে নমস্কার'।

কি দুষ্টু মেয়ে এই বুড়ুটা! একদিন সকালবেলায় রিক্‌শ চড়িয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে গেছলাম, সেখানে আমার আঙুল ধরে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে বেড়াতে লাগলো। সামনে একটু জলকাদা থাকায় কোলে তুলে নিলাম। অমনি সেই থেকে ধরে বসেছে কিছু মুশকিলে পড়লেই তাকে কোলে করতে হবে। সেদিন ঘরে বসে পড়ছি, নীচে সিঁড়ির তলা থেকে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, "দাদু, কো-কো (অর্থাৎ কোলে চড়ে যাবে', পায়ে কাদা লাগবে।" অথচ বাড়ির ত্রিসীমানায় কোথাও কাদা নাই, সবই ইঁট, কাঠ আর সিমেণ্ট, তবু বুড়ুর হুকুমে নীচে নেমে তাকে কোলে করে আমার পড়ার ঘরে আনতে হল।

আর পড়ার ঘরেই কি তার হুকুমের অন্ত আছে। টেবিলের মাঝখানে বইপত্র সব সরিয়ে খেলার জায়গা করে দিতে হবে, হাতে এক টুকরা খড়ি চাই। আর সে সেই খড়ি দিয়ে এক একটা আঁচড় কেটে বলবে, এইটে ছোটমা, এইটে কাকা, এইটে পাখী, এইটে জলি অর্থাৎ বাড়ির ঘেউ-ঘেউ। কোন্‌টি যে কোন্ পদার্থ সে ছাড়া কেউ বুঝতেও পারে না, আর একই জিনিস বার বার আমাকে বুঝিয়ে বলতেও তার ক্লান্তি নাই। আমার টেবিলের উপরে নানা দেশ-বিদেশের নদী থেকে কুড়িয়ে আনা মসৃণ পাথর কাগজ চাপা দেবার জন্য থাকে। তার কোনটি হয়তো হাজারিবাগ জেলার রাজ রোপ্পার ধার থেকে আনা, কোনটি ময়ূরভঞ্জের, কোনটি বা কাশ্মীরের অমরনাথ তীর্থ থেকে কুড়িয়ে আনা। বুড়ুর কাছে কিন্তু সবই খেলার সাবান।

হাতে করে সেই সাবান ঘসবে, আমার গায়ে মুখে মাখিয়ে দেবে। চোখে মাখানর সময়ে আবার হুকুমমত চোখ বুজতে হবে। তারপর মিছামিছি চান করিয়ে দেবে, গা মুছিয়ে ভাত খাইয়ে দেবে। তারই মধ্যে হয়তো আবার তাকেও ভাত খাইয়ে দিতে হবে। এই সব সারতে অবশ্য সবসুদ্ধ দুমিনিটের বেশী সময় লাগে না। তার পরেই হয়ত বল নিয়ে "গোল" খেলা আরম্ভ হবে, নয়তো ছাতে গিয়ে "ধরতো-ধরতো-রেডি" খেলার জন্য আবদার করে বসবে।

এমনি করে বুড়ুর খেলার চাপে অনেক দিন আমার সকালবেলার সব পড়াই মাটি হয়ে যায়। কলেজ সেদিন বন্ধ ছিল, আমি দুপুরে শুয়ে ঘুমাচ্ছি, এমন সময়ে বুড়ু আমার পাশে এসে বেশ ঘটা করে পিঠে হাত বুলুতে আরম্ভ করে দিল। বেশ লাগছিল, কচি কচি নরম হাতদুটি পিঠের উপর এলোমেলোভাবে বুলিয়ে যাচ্ছে, বেশ আরামই হচ্ছিল। এমন সময়ে দেখি তার মা তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির। দুপুরে মায়ের কাছে ঘুমাচ্ছিল, ঘুম ভেঙে যেতে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে। মা জেগে দেখে বুড়ু নাই। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। অতএব বুড়ু নিশ্চয়ই কোন অপকর্মে ব্যস্ত আছে। এসে দেখে আমার জুতার কালির কৌটা দখল করে খামচা খামচা রং বের করেছে আর এসে আমার পিঠে বেশ করে মাখিয়ে দিচ্ছে। মাঝখান থেকে আমি খানিক বকুনি খেলাম। আমার জুতার কালিও গেল, আবার দোষও আমার হল, তাকে ঠিক মত দেখিনি কেন!

সত্যি, দুবচ্ছরের ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত থাকে, কখন কি করে বসে তার তো ঠিক নাই!

* * *

সেদিন রাস্তায় বেরিয়েছি, হঠাৎ বিষম গণ্ডগোল বেধে গেল।

কংগ্রেসের বহু নেতা বোম্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর গ্রেপ্তার হয়েছেন। সারা ভারতবর্ষময় বিক্ষুব্ধ জনতা পাগলের মত সব লণ্ডভণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ক'লকাতাতেও তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে, এবং ফলে পুলিসের পক্ষ থেকে গুলিও চলছে। জনতার এই বিক্ষুব্ধ মনোভাবকে ব্যর্থ চেষ্টা হতে ফলপ্রসূ অহিংসার পথে আজ কে নিয়ন্ত্রিত করবে? মহাত্মা গান্ধী দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর সাত্ত্বিক পথে জনশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর বাণীকে সর্বজনের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা হয়তো কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা যে কত সামান্য, কত অকিঞ্চিৎকর হয়েছে আজ তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

* * *

বাড়ি থেকে সরাসরি গাড়ি চড়ে চলেছি সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামান্য দু-চারখানি জিনিস নিয়েছি মাত্র। যেমন জিনিস নিয়ে ভারতবর্ষের তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করেছি, আজও আমার সঙ্গে তার চেয়ে বেশি কিছু নাই। মোটর শহরের প্রান্তে এসে যখন আদিগঙ্গার পুলের উপর দিয়ে পার হল তখন দেখলাম বর্ষার নূতন জলে ছোট খালটি যেন একেবারে ভরে গেছে। ঘোলা জল দুই কূল ছাপিয়ে সাহেবদের বাগানবাড়ির ভিতরেও উপচে পড়েছে। আমারও বুকটা যেন কেমন ভরে উঠলো। কোথাও কোন দৈন্য নাই, অভাব নাই, মরা গাঙের মধ্যেও আজ পরিপূর্ণ বন্যার সাড়া পড়ে গেছে।

পুল পার হয়ে সরকারি গাড়ি একটি জনবিরল পথের দিকে বেঁকে যেতে খাকি পোশাক-পরা একজন শান্ত্রী এসে ড্রাইভারকে থামাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ড্রাইভার চেঁচিয়ে "রাজবন্দী" এই কথা বলে বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

ছোট্ট একখানি ঘর, ছ হাত লম্বা ছ হাত চওড়া। দেওয়ালে প্রায় কোমরের সমান পর্যন্ত আলকাতরা লাগান, উপরে চুনকাম করা। তাতে অপটু হাতে ইংরেজী অক্ষরে লেখা রয়েছে 'করিম'। হয়তো করিম নামে কোনও বন্দী পূর্বে এই ঘরে বাস করে গেছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই চাবি দিয়ে যায়, তুপুরেও তুঘণ্টা সেই রকম নিয়ম। অনেকখানি উপরে একটি ছোট্ট জানালা আছে, তার ভিতর দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসে বলেই বোধ হয় কম্বল বেঁধে সেটিকে প্রায় বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে মোটা গরাদের দরজা, তার ভিতর দিয়ে পাঁচিলের ওপারে একটি আমগাছের মাথাটুকু দেখা যায়। ভোরের বেলায় কাক ও শালিকের সঙ্গে মাছরাঙার ডাকও শুনতে পাই। আলো হলে যখন ঘর খুলে দেয় তখন পাঁচিলের পাশে ত্রিশ চল্লিশ হাত জায়গায় আমারই মতন আরও চার পাঁচ জন মিলে পায়চারি করে বেড়াই। কিন্তু ঠিক সেই জায়গাটিতে রৌদ্রের আলো পৌঁছাতে একটু দেরি হয়।

একটি সাদা রঙের বক আমগাছের মাথার খানিক উপর দিয়ে উড়ে গেল। তার সাদা পালকে সকালের আলো পড়ে যেন একটু সোনালি রঙের ছোঁয়া লেগে গেল। বক, মাছরাঙা, এদেরই তো বেশি দেখা যায়, হয়তো কাছে কোনও বৃহৎ জলাশয় আছে। একটু বেলায় দেখি একটি পানকৌড়ি মুখে শুকনা পাতাসুদ্ধ অশ্বত্থের একটি ভাঙা ডাল নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। হয়তো আজকার দিনে তার কাছে ঘর বাঁধা বেশি প্রয়োজন হয়েছে না হলে সকাল বেলাতেই ডালপালা সংগ্রহের জন্য সে এত ব্যস্ত কেন?

মাথার অনেক উপরে মেঘের কোলে চিল এবং শকুনের দল উড়ে বেড়ায়, আর তাদের মধ্যে কখনও কখনও ইংরেজদের উড়ো জাহাজকে

একটা প্রকাণ্ড পাখীর মত দেখতে পাওয়া যায়। কখনও বা শকুনের দল এই বিশাল হিংস্র পাখীর কদর্য গর্জন শুনে নীচু হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করে।

কদিনের মধ্যে দাড়িগুলো বড্ড বড় হয়ে উঠেছে, আজ কামাতেই হবে। দেশনেতাদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘশ্মশ্রু অবস্থায় বেরিয়ে আসেন। আমার তো সে অবস্থা নয়, অতএব দাড়ি কামাতেই হবে।

নিজের থলির ভিতর থেকে কামানোর সরঞ্জাম বার করে জল নিয়ে টেবিলের সামনে বসলাম। সাবানের কৌটা খুলে হঠাৎ দেখি তাতে কচি কচি আঙ্গুলের ও নখের দাগ রয়েছে। সত্যিই তো, বুড়ুকে সেদিন খেলার জন্য আমার সাবানের কৌটা দিতে হয়েছিল, আর সেও প্রাণপণে সেটিকে খুঁড়ে খুঁড়ে হাতে মুখে গালে মেখেছিল।

আজ আমার নিরালা ঘরে বসে তার আঙ্গুলের দাগটুকু বড় ভাল লাগছে। কত দিন থাকতে হবে তা তো জানি না। আমার এই ক্ষুদ্র সম্পদটুকু নষ্ট করতে আজ বড় মায়া হচ্ছে। না হয় নাই কামালাম, বুড়ুর আঙ্গুলের এই ছোট্ট দাগটুকু তো আমার কাছে থেকে যাবে!

অজয় নদী

কয়েক বৎসর আগেকার কথা। ঘটনাটি সামান্য হইলেও সে সময়ে আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছিল এবং শুধু আমার জীবনেই করিয়াছিল বলিয়া আমি ইহা কোথাও লিখিয়াও রাখি নাই, দু-একজনকে ছাড়া ইহার কথা কাহাকেও বলিও নাই।

জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যে জন্য আমার পক্ষে পূর্ব হইতে হয়তো সাবধান হইলে ভাল হইত; কিন্তু নিজের স্বভাবের দোষে তাহা পারি নাই। ফলে বাহিরের জগতের কাছে চোট খাইয়াছি। তথাপি মনের মধ্যে এই বলিয়া তৃপ্তি লাভ করিতাম যে নিজের সত্যকে তো পরাস্ত হইতে দিই নাই! কিন্তু হইলে কি হয়, দুঃখ তো আঘাত দিয়া যায় এবং সকল সময়ে তাহা সইবার মত অবস্থাও থাকে না। সেইজন্য খানিক স্বস্তিলাভের আশায় মাঝে মাঝে কোনও জনহীন স্থানে গিয়া নিজের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে বোঝাপড়া করিয়া লইতাম।

এমনই একদিনকার ঘটনা। তখন বর্ষাকাল, ভরা শ্রাবণ মাস। নানা ঘটনার সংঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া সেদিন অজয় নদীর কূলে পলাইয়া গেলাম। পাড়ের জমি শরের বনে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে দু-একটি বাবলা গাছ এবং নীচে গেরুয়া রঙের ফেনিল নদী খরস্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। ওপাশে কাশ এবং শরের বন, দূরে একটি পরিত্যক্ত গ্রামের জীর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল। ঘনবিন্যস্ত পুরাতন আম-কাঁঠালের বাগান ভেদ করিয়া তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পরিত্যক্ত গ্রামের অধিবাসিগণ নদীর পারে আরও কিছু দূরে সরিয়া গিয়া নিজেদের কুটীর নির্মাণ করিয়াছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরশ্রেণী এবং লেবুর ক্ষেত দূর হইতেও দেখা যাইতেছিল।

বসিয়া বসিয়া নিজেরই কথা ভাবিতে লাগিলাম। যাহারা আমাকে আঘাত করিয়াছে, তাহাদের কথা। মনের ভিতর হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে সকল ক্রোধ, সকল বিদ্বেষকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহা যেন সম্ভব হইতেছিল না। চারিদিকে এত মূঢ়তা, এরূপ স্বার্থ এবং অহমিকার ধূম যে তাহার জ্বালায় হৃদয় ভারাক্রান্ত ও পীড়িত বোধ হইতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ আমার সামনে সামান্য একটি বাবলা গাছের ডালের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। ছোট ডাল কচি কচি পাতা লইয়া নদীর কূল হইতে জলের নিমন্ত্রণে যেন নীচের দিকে নুইয়া পড়িয়াছে। ঠিক কি হইল বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ এই সামান্য দৃশ্যটি দেখিয়া আমার দুই চোখ প্লাবিয়া জল ভরিয়া আসিল। একটি সামান্য বাবলার পাতায় যে এত সৌন্দর্য নিহিত থাকিতে পারে তাহা কখনও ভাবি নাই। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহারই রূপে ভরিয়া গেল। নীচে নদী, ওপারে বালুর চর, শরের বন, আর দূরে ঘন সবুজ বনরেখা—সব যেন এই তরুণ পল্লবের মন্ত্রস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। আমি আর তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। বাহিরের সমগ্র প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া ছিলাম না বটে, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলাম। মনে হইতে লাগিল যে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আজ তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া আমাকে প্লাবিত করিতে আসিতেছে। ঝড় বহিলে যেমন হয়, আমার কানে তাহারই মত শব্দ ভাসিয়া আসিতে আসিল এবং ক্ষণেকের জন্য মাঠ, ঘাট, নদী, তরুশ্রেণী

এমন কি সেই ক্ষুদ্র বাবলার পাতাগুলি পর্যন্ত অপার সৌন্দর্য-তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া আমাকে ডুবাইয়া দিয়া গেল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল জানি না। কিন্তু যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন ক্ষমায় এবং প্রেমে আমার সমগ্র অন্তঃকরণ ভরিয়া গিয়াছিল। বিশ্বজনের কাহারও বিরুদ্ধে আমার আর কোনও অভিযোগ ছিল না। যে মাটির উপরে বসিয়াছিলাম, তাহাও আপন হইতে আরও আপনার হইয়া গেল। গাঢ় প্রেমের বশে তাহাকে চুম্বন করিলাম।

* * *

ইহাই সেদিনকার ঘটনা। ঘটনাটি এমনই বা কি! একটি সামান্য বৃক্ষপত্রের সৌন্দর্যে ক্ষণেকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম বই তো নয়! কিন্তু যাহাই হউক, ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া সর্বক্ষণ যেন এক অশ্রুস্নাত আনন্দলোকে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কাহারও প্রতি কোনও দ্বেষ রহিল না, যাহাদের পূর্বে বিরোধী জ্ঞান করিয়াছিলাম, মনের মধ্যে তফাত করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাদেধ আজ পরিপূর্ণ ক্ষমায় বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারি, এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু এইভাবে বহুদিন কাটিল না। কয়েক দিবস পরে ধীরে ধীরে মনে হইল আমার প্রেমের দ্বারা বিশ্বজনকে তো জয় করিতে পারিলাম না! তাহারা যেমন অন্ধ ছিল তেমনই থাকিয়া গেল, তাহাদের আলস্যের, ভয় এবং অবসাদের পর্বত-স্তূপ তো আমি বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারি নাই। তখন অজয়ের কূলে আমার ক্ষণিকের জন্য সৌন্দর্যের অনুভূতিকে বিলাসের মুহূর্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল, আচ্ছা, ঐ মুহূর্তে আমি এমন কি নূতন

বস্তু লাভ করিয়াছিলাম যাহার জন্য সেই অনুভূতির পুনরাবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি ? ভাবিয়া দেখিলাম, নূতন কিছু পাই নাই। সমগ্র বিশ্বমানব যে এক, ইহা বুদ্ধির দ্বারা ইতিপূর্বে অনুভব করিয়াছিলাম। কর্মে সততঃ তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বাহিরের তমসার সহিত সংগ্রামের মধ্যে হৃদয়ে সে বিশ্বাসটি হয়তো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সেদিন কেবল নদীর কূলে ক্ষণিকের জন্য সেই অনুভূতিই লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার দৃষ্টি এমন কী বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, নূতন কোন্ জ্ঞানই বা লাভ করিয়াছিলাম ? বরং সেদিনকার অনুভূতির বশে এমন একটা ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা আমার কর্মের শক্তিকে বৃদ্ধি না করিয়া বরং গোপন বিলাসের এক পথ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল। হয়তো সেইজন্যই আর ওপথে যাইবার বাসনা হয় নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া আজ যে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ভুলিয়া গিয়াছি তাহা নহে। হিমালয়ের ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি—পর্বতমালা ধূসর হইতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হইতে নীল এবং অবশেষে নীল হইতে শুভ্র জমাট মেঘের আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথায় তাহার আরম্ভ, কোথায় মেঘলোকের সমাপ্তি, সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। তাহার রূপের তুলনা হয় না। সে রূপে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়ের মধ্যে কোথায় যেন গোপন ভার অনুভব করিয়াছি, সেই সৌন্দর্যকে অবহেলা করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিয়াছি, কিন্তু তাহা অজয় নদীর মত কখনও আমাকে আচ্ছন্ন বা মোহাবিষ্ট করিতে পারে নাই।

হিমালয় দেখিয়া অন্তরে বল পাইয়াছি, মনে হইয়াছে ইহা যেন আমাদের যুদ্ধাক্রান্ত বন্ধুর জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবনে যে সকল

ওঠা-নামা ঘটিয়াছে পাহাড়ের স্তরবিস্তীর্ণ রূপ যেন তাহারই সাক্ষ্য দেয়। কেবল ভরসার বিষয় এই যে, জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যখন গহন বনাকীর্ণ উপত্যকায় দিশাহারা হইয়া পড়ি তখন হিমালয়ের মধ্যে কৃষ্ণ পর্বতশ্রেণীর পরপারে যে অনন্ত বীর্যমণ্ডিত শুভ্র তুষারের জয়কিরীট বিরাজ করে তাহার কথা স্মরণপথে উদিত হয় এবং তাহা অন্তরে ভরসা এবং সহিষ্ণুতা ফিরাইয়া আনে।

সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে মানুষ ইহা অপেক্ষা আর কী বেশী আশা করিতে পারে ?

"গল্প বল"

বুড়ুর ছোট বোন রত্না। বুড়ু এখন বড় হয়েছে, তার বোন রত্নাই পাঁচ বছর পার হয়ে ছয়ে পা দিয়েছে।

কদিন ধরে রত্নার বড্ড জ্বর চলছে। জ্বর ১০৪।৫° পর্যন্ত ওঠে, ১০২°-এর নীচে নামে না। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, টাইফয়েড, এবং সেই মত চিকিৎসাও চলছে।

রত্না বড় শান্ত মেয়ে। লাল নীল পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে ভালবাসে। ছবি আঁকার অভ্যাস তার তিন বছর বয়স থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কলেজ থেকে আমি যে সব খড়ির টুকরা এনে দিতাম, তাই দিয়ে মেঝের উপরে নানা রকম দাগ কাটত, তার কোনটা পাখি, কোনটা মেয়েদের নাচ। কোন্‌টে যে কি, তা ছবি আঁকার পর নিজেই গল্প করে বলে দিত। আজকাল ছবি আর একটু ভাল আঁকতে পারে, মহাদেবের ছবি, মা কালী খাঁড়া ধরে আছেন তার ছবি, ঘরবাড়ি বাগানের ছবি—নানাধরনের ছবি আঁকে। দেখে অন্ততঃ না বলে দিলেও বোঝা যায়। রত্নার ছবিকে যদি কেউ নিন্দা করে তাহলে তার বড্ড দুঃখ হয়, আমার কাছে এসে অভিমান করে কেঁদে ফেলে। পড়াশোনার মাঝখানে কথা বললে যদি বিরক্ত হয়ে কোনদিন বকি, তাহলে মেয়ের সে দুঃখ ভুলতে পাঁচসাত দিন সময় লেগে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প শোনার জন্য যখন আমার কাছে শুয়ে থাকে তখন পুরনো কথার উল্লেখ করে এক-একদিন কান্না হয়, কেন তাকে সেদিন বকেছি, না ব'কে বললেই তো হত—আমি

এখন পড়ছি, একটু সরে যাও। এমনি করে রত্নার মান-অভিমানের পালা চলে।

রত্নার বোনেরা গান গাইতে পারে, রত্নারও গান গাইতে ইচ্ছা হয়। 'ছোটদের পড়া'য় সত্যেন দত্তের 'পাল্কীর গান' তার খুব ভাল লেগেছে। 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটিও তার ভাল লাগে, কিন্তু লম্বা লম্বা কথা সব তার মনে থাকে না, কেবল মনে করিয়ে দিতে হয়।

সেদিন জ্বর যখন খুব বেশি হয়ে এসেছে, তখন থেকে তার কেবল খেলনা নিয়ে খেলার ইচ্ছা বেড়ে গেল। জ্বরের তাপে ফরসা কচি মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, মাথার চুল ছোট্ট করে কাটা, তাতে ক্রমাগত জলপটি চলছে। কিন্তু শুয়ে শুয়েও তার খেলার বিরাম নাই। আজকাল প্লাস্টিকের নানারকম খেলনা বিক্রি হয়। তাই দিয়ে বাগানওলা বাড়ি, কুকুর পাহারা দিচ্ছে, সামনে ঘোরানো চেয়ারে ছোট্ট পুতুল বসে আছে—এমনই করে সব সাজিয়ে দিতে হল। তার সামনে মাঠের মাঝখানে উনুন পাতা হল, তার ওপর কড়ায় ছোট্ট হাতা দিয়ে দুধ জ্বাল হতে লাগলো। সামনে চাকি বেলুন, ভাতের থালা, তাতে মিছিমিছি সব পরিবেশন করতে হল। এ সব নিজে সে সাজাতে পারছে না বলে তার ফরমাশমত আমাকে সাজিয়ে দিতে হল। টুলের ওপরে যেখানে সব সাজানো হয়েছে, সেখানে একটু জায়গা বাকি ছিল, প্লাস্টিকের ছোট্ট গ্রামোফোনটি সেখানে বসিয়ে দিতে হল। রত্না গুনগুন করে গান ধরলে—

পাল্কী চলে পাল্কী চলে গগনতলে আগুন জ্বলে।
স্তব্ধ গাঁয়ে আদুড় গায়ে যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা।
পাল্কী চলে পাল্কী চলে দুলকি চালে নৃত্য তালে।

যারা বাড়ির সামনে বাগানে রান্না সেরে খাবার আয়োজন করছে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য রত্না এই গানের আয়োজনটুকু করে একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়ল। চোখ বুজে আমাকে বললে, তুমি পুতুলের গল্প বল। আমি পুতুলের ঘর বাড়ি তৈরি থেকে চড়ুইভাতি পর্যন্ত সব গল্প বললাম। রত্না চোখ বুজে শুনতে শুনতে জ্বরের তাড়সে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কদিন ধরে যতক্ষণ জ্বর বেশি থাকে ততক্ষণ সকাল-সন্ধ্যা, যখনই কলেজের কাজের সময় বাদ দিয়ে তার কাছে বসি, তার এক দাবি— 'গল্প বল' 'গল্প বল'। গল্প শুনতে শুনতে, একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই রত্না ঘুমিয়ে পড়ে। আবার জ্বরের মধ্যে মাঝে মাঝে হয়তো চমকে ওঠে। গল্প শোনার ইচ্ছার তার বিরাম নেই। নিজ বিছানায় সম্পূর্ণ বন্দী হয়ে রয়েছে, রোগা হাত-পাগুলিকে ধরে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়; কিন্তু শরীরের সকল কষ্ট, সমস্ত দুর্বলতাকে কল্পনার জোরে, গল্পের যাদুমন্ত্রবলে মনের সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে চায়, তার মন বর্তমানের বেদনাকে কল্পনালোকে আশ্রয়ের দ্বারা পরাস্ত করতে চায়।

রত্নার জ্বর দিনের পর দিন একটানা চলেছে। মেয়েটা রোগা কাঠির মত হয়ে গেছে, আমারও দুশ্চিন্তার অবধি নাই। রোগে ছটফট করা বা শরীরের কষ্টের জন্য রাগ বা বিরক্তি, কিছুই তার নাই। শান্ত সবুজ দূর্বাঘাসের মত যেন মাটিতে মিশিয়ে রয়েছে। কেবল মনের রাজ্যে তার কত কি ছবি যেন ভেসে ভেসে যায়। সেইখানে খোরাক দিতে পারলেই আর তার যেন কোনও অভাব থাকে না।

* * *

ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম, দেওয়ালের কোন কোন জায়গা জুড়ে এক-একখানি বাঁধানো ছবি টাঙানো রয়েছে।

মা অন্নপূর্ণা ভিখারী মহাদেবকে ভিক্ষাদান করছেন, শ্রীমতী রাধা অভিসারিকাবেশে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোন ঘরে বা সুইজারল্যাণ্ডের বরফাচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গের ছবি আঁকা রয়েছে, নীচে হরিদ্বর্ণ উপত্যকাভূমিতে ধবলকায় ধেনুরা বিহার করছে। মনে হল, সাদা দেওয়াল যেন আমাদের মনকে পীড়া দেয়, তাই আমাদের মনও রত্নার মত নিজের অন্তরে কল্পনার আবরণ সৃষ্টি করার জন্য বারংবার যেন বলছে—'গল্প বল' 'গল্প বল'। 'এই রক্তবিহীন দেওয়াল আমি সহ্য করতে পারছি না, গল্পের আবরণে আমার চারিদিক আবৃত করে দাও।'

বাইরে এলাম। চারিদিকে মানুষের দুঃখের সীমা-পরিসীমা নাই। আজ বৈশাখ মাস। প্রখর রৌদ্রতাপে সমস্ত শহর যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে, ফুটপাথের উপরে, একখানি বাড়ির স্বল্পকায় ছায়াকে আশ্রয় করে অস্থিচর্মসার, প্রায় নগ্নদেহ, গৃহহারা মধ্যবয়সী একজন মানুষ নিদ্রাগত হয়ে আছে। তার পাশে নগ্নদেহ এক শিশুও ঘুমিয়ে রয়েছে। পূর্ববঙ্গে যে ভয়াবহ অবস্থা চলেছে, হয়তো তা থেকে মুক্তি পাবার ভরসায়, একটু অন্ন এবং ততোধিক স্বল্প আশ্রয়ের আশায় মানুষটি হয়তো মহানগরীর পথকে আশ্রয় করেছে। অন্ন তার মেলেনি, ভালবাসা সে পায়নি। এই অবহেলা এবং অনাদরের মধ্যে পথের পাশে ভুক্তাবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের স্তূপের নিকটে একজন অস্থিচর্মসার মানুষ এবং একটি ক্ষীয়মাণ শিশু কতটুকুই বা সান্ত্বনা পেতে পারে, নিদ্রা তাদের দুঃখকে কতক্ষণই বা ঠেকিয়ে রাখতে পারে! অনাহার এবং অবহেলার কষ্ট অথবা মৃত্যুর যে করাল ছায়া ক্ষণে ক্ষণে এদের মনের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, মহানগরীর এক কল্পিত রূপকে আশ্রয় করে তারা সেই ভয় থেকে বাঁচতে চায়।

শামুক যেমন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিজের চারিদিকে কঠিন বর্ম রচনা করে, মানুষও তেমনই বাস্তবের আক্রমণ থেকে নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্য কল্পনার বর্ম দিয়ে নিজের দৃষ্টিকে আবৃত রাখতে চায়।

মৃত্যুর ভয় থেকে বাঁচার জন্যই যেন মানুষের কিন্তু যুগের পর যুগ কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনের সম্মুখে নিজের সত্যকার রূপকে প্রকাশিত করলেন, তখন অর্জুন যে রূপ দেখতে পেলেন সে রূপ ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর, অন্তরাত্মাকে ব্যথিত করে।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাসনং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বাহিত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শসং চ বিষ্ণো॥

—হে বিষ্ণো, তোমার দেহ গগনস্পর্শী এবং দীপ্তিমান, তোমার বর্ণ অনেক প্রকার, তুমি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে ; তোমার নেত্র অতি বিস্তৃত ও দীপ্তিময়, তোমাকে দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথা পাইতেছে। আমি ধৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

—তোমার মুখসমূহ দংষ্ট্রারাজি দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মুখসকল যেন প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছে। ঐ সকল মুখ দেখিয়া আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি, আমি কিছুতেই সুখ পাইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও।

ইহাই সত্য রূপ। কিন্তু অর্জুনের মন সত্যের বিভীষিকাকে পুরতঃ পশ্চাৎ সর্বদিক হতে প্রণাম করে শ্রীভগবানকে বললেন, আমি

তোমার এ রূপ সহ্য করতে পারছি না। তুমি সখার মত, বন্ধুর মত, ঐশ্বর্যযুক্ত কিন্তু প্রসন্নরূপে আমার সামনে আবির্ভূত হও। আমার প্রার্থনায় নিজের সত্য স্বরূপকে সংবরণ কর। আমার মন যে রূপে তোমাকে চায়, সেই রূপেই তুমি পুনরায় আবির্ভূত হও। কল্পনা-লোকের জয় হোক, নতুবা আমার দৃষ্টি হুতাশনে প্রজ্বলিত হয়ে যাবে।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন সহস্রবাহোভব বিশ্বমূর্তে॥

—আমি তোমাকে সেই প্রকারে পূর্বের ন্যায় কিরীটভূষিত, গদাধারী এবং চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তে, হে সহস্রবাহো, তুমি আবার পূর্বের ন্যায় সেই নিজ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও।

এই মানুষের চিরন্তন প্রার্থনা। সেই ইচ্ছারই জয় হোক। ইচ্ছার তরণীই সত্যের অকূল পারাপারের মধ্যে আমাদের আশ্রয় স্বরূপ বহন করে নিয়ে চলুক।